গায়ত্রী চক্রবর্তী

গুপ্তচরবৃত্তি

প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগ

গুপ্তচরবৃত্তি

প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগ

প্রাক্তন শিক্ষিকা, গায়ত্রী চক্রবর্তী, বি বি কলেজ ও উষাগ্রাম গার্লস হাইস্কুল, আসানসোল।
গবেষণার বিষয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Espionage in Ancient India।

গুপ্তচরবৃত্তি

প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগ

গায়ত্রী চক্রবর্তী

অবভাস

Guptocharbritti
by Gyatri Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: অগাস্ট ২০১৪
© লেখক
প্রচ্ছদের ছবি : প্রাচীন ভারতে 'বিষকন্যা' গায়ত্রী চক্রবর্তী
ISBN 978-93-80732-05-3

মূল্য : ১২০.০০

প্রকাশক পার্থ চক্রবর্তী, অবভাস, কে বি রায় গার্ডেন, গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা-৮৪, ফোন : ৯৪৩৩২৩৪৩৪৬ ই-মেল : ababhash@gmail.com
ওয়েব সাইট www.ababhash.wordpress.com
ফেসবুক : www.facebook.com/ababhash.publisher
বর্ণস্থাপক সুদীপ দাস বরাহনগর, কলকাতা-৩৬
মুদ্রক ডি. অ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি. গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-১৩২

সূচি

ভূমিকা	...	৭
প্রাসঙ্গিক	...	৯
বৈদিক যুগ	...	১৩
বৌদ্ধ যুগ	...	১৬
ঐতিহাসিক যুগ (খ্রি. পূ. চতুর্থ-দ্বাদশ শতক)	...	২০
মধ্যযুগ	...	৪৫
সামরিক বিভাগে গুপ্তচর	...	৫৭
রাষ্ট্রদূত ও তার আচরণ	...	৮৪
উপসংহার	...	১০৮
উদ্ধৃতিসূত্র	...	১১০

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার পর প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণ করার অনুরোধ জানান। দ্বিতীয় সংস্করণে দুটি অধ্যায়ে বড়ো পরিবর্তন হয়েছে। 'সামরিক বিভাগে গুপ্তচর' এবং 'রাষ্ট্রদূত ও তার আচরণ' অধ্যায় দুটি বেশ কিছুটা পরিবর্ধিত হয়েছে। সবশেষে একটি উপসংহার যুক্ত হয়েছে। আশা করি পাঠকদের বইটির বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হবে।

এপ্রিল ২০১৪

প্রথম সংস্করণ

বিশ্বের ছোটো বড়ো সমস্ত রাষ্ট্রে গুপ্তচর শাসনব্যবস্থার এক বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রতিরক্ষা ও সামরিক সাফল্যের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত, সুদক্ষ গুপ্তচরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধুনিক যুদ্ধ, অর্থাৎ Modern war is an war of espionage.

গুপ্তচর ব্যবস্থা উৎপত্তির সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সভ্যতার উষাকাল থেকে গোষ্ঠী সংঘাতে বিভিন্ন দলপতিরা একে অপরের গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। কালক্রমে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখায় গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, গ্রিস, রোম, আরব প্রভৃতি দেশে গুপ্তচর শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এম এ পড়ার সময় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থটি আমাকে আকৃষ্ট করে।

এই গ্রন্থটিতে কৌটিল্য বা চাণক্য নামক কূটনীতিবিদ গুপ্তচর প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর মতে সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসকের ব্যক্তিগত সুরক্ষার প্রধান হাতিয়ার গুপ্তচর। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. করুণাপদ দত্ত বিষয়টি নিয়ে আমাকে গবেষণা করার পরামর্শ দেন। তার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Espionage in Ancient India বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি লাভ করি। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. পুষ্প নিয়োগীর অধীনে গবেষণা শুরু করি। কাজটি যথেষ্ট দুরূহ ছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট পারদর্শী হলেও ইতিহাস রচনায় নন। প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি দেশি লেখকদের রচনা, বিদেশি লেখকদের লেখা সাহিত্য, ইতিহাস, শিলালিপি, তাম্রলিপি এবং মুদ্রার সাহায্য নিয়েছি। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমি কখনো কল্পনা বা প্রচলিত জনশ্রুতিকে প্রশ্রয় দিইনি। ১৯৮৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি Espionage in Ancient India নামক গবেষণা পত্র দাখিল করে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করি।

১৯৯০ সালে আমার কাকা সাংবাদিক ফণীভূষণ চক্রবর্তী এবং প্রকাশক সুশীল মুখার্জীর প্রচেষ্টায় Espionage in Ancient India গ্রন্থটি মিনার্ভা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

২০০৭ সালে *অবভাস* পত্রিকায় Espionage in Ancient India-র সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। পার্থ চক্রবর্তী অবভাসের পক্ষ থেকে আরও কিছু তথ্য দিয়ে বিষয়টি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা জানান। তার ফলে আমি সুলতানি ও মুঘল যুগ সময়কালের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের ভূমিকা সংযোজন করি। সুলতান ও মুঘল সম্রাটগণ শাসনব্যবস্থার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অনেক তথ্য নষ্ট হয়ে গেলেও বিভিন্ন জাতীয় সংগ্রহশালায় এই সব রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। এসব তথ্য নির্ভরযোগ্য।

গায়ত্রী চক্রবর্তী

প্রাসঙ্গিক

রাষ্ট্রের সুশাসন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার কারণে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ শাসনব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বের ছোটোবড়ো সমস্ত রাষ্ট্রেই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র, সামরিক বিভাগ এবং পুলিশ দপ্তর— অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রেই রয়েছে গুপ্তচর। বিভিন্ন বিভাগে গুপ্তচরদের ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থার নাম ID, IB, CBI, CID ইত্যাদি।*

বর্তমান বিশ্বের দুই শক্তিশালী গুপ্তচর সংস্থা— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের CIA, রাশিয়ার KGB। ১৯১৮ সালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলার জন্য লেনিন CHEKA নামে একটি গোপন সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সালে CHEKA-র পুনর্গঠন করে নাম দেওয়া হয় KGB.**

রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য গুপ্তচরের সৃষ্টি হলেও মাঝে মাঝে এই সংস্থা নিপীড়ন-যন্ত্র হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণে গুপ্তচর-সংস্থা যে কত নৃশংস হয়ে উঠতে পারে তার অজস্র নজির আছে। উত্তর আমেরিকার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) চলাকালীন উত্তর আমেরিকায় K. K. K (Ku-Klux-Klan) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্তচর-সংস্থা দক্ষিণ আমেরিকায় শ্বেতপ্রাধান্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়। K. K. K কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করত। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার জর্জিয়ায় শ্বেতাঙ্গ প্রোটেস্ট্যান্টরা K. K. Kর একটি শাখা স্থাপন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে ১৯৩৬ সালে জার্মানিতে তৃতীয় রাইখ-এর প্রধান নিযুক্ত হন নাৎসিবাদের জনক হিটলার। হিমলার প্রথমে হিটলারের দেহরক্ষী ছিলেন। নাৎসিরা জার্মানিতে গেস্টাপো (Secret State Police) নামে এক গুপ্তচর সংস্থা স্থাপন করে। হিটলার হিমলারকে গেস্টাপোর দায়িত্ব অর্পণ করেন। হিমলার ইহুদি নিধনযজ্ঞের নায়ক হয়ে ওঠেন। তার নির্দেশে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং এক্সটারমিনেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ অসহায় নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৫ সালে হিমলার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

---

* ID = Intelligence Department IB = Intelligence Branch CBI = Central Bureau of Investigation CID = Criminal Investigation Department • (Central Intelligence Agency)

** KGB = (Russian Komityet Gosudarstvyennoi Byezopasnosti)

সম্প্রতি ফিলিপ এজি এবং লুইস উল্‌ফ প্রকাশিত *Dirty Work* (The CIA in Western Europe, 1978) গ্রন্থে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে C. I. A-র গোপন লজ্জাজনক ও নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়।

গুপ্তচর ব্যবস্থার সঠিক কাল নির্ণয় করা মুশকিল, তবে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃত্তি। সভ্যতার ঊষাকালে মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে লাগল তখন থেকেই শুরু হল গোষ্ঠীসংঘাত। বিবদমান দলের সর্দাররা একে অপরের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর পাঠাত। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে ইস্রায়েলের যোশুয়া dead sea-র উত্তরে (অধুনা জর্ডনে অবস্থিত) জেরিকো খ্রি.পূ. ১৩০০ অব্দে অধিকার করেন। এই রাজ্য আক্রমণের আগে যোশুয়া শত্রুশিবিরের সামরিক শক্তির সঠিক খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন।[১] গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়ড থেকে জানা যায় দোলোন নামে ট্রয়-এর এক চর আর্গোসরাজ ডায়োমেডেসের হাতে নিহত হয়। ট্রয় যুদ্ধের এক প্রধান নায়ক ইথাকার রাজা ওডিসিউয়াস চর মারফত থ্রেশিয়ান শিবিরে কড়া নজর রাখেন। গভীর রাতে শত্রু শিবিরের সৈন্যরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন ওডিসিউয়াস তাদের উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলি চুরি করেন।[২]

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ ভারত, গ্রিস, চীন, পারস্য, রোম, মিশর, সিরিয়া ও আরব সর্বত্রই শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। প্রাকযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন সময় এবং যুদ্ধশেষে একে অপরের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর পাঠানো হতো। টেল-এল-আমার্না ও বোখাজ কোই ফলকের উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় খ্রি.পূ. তৃতীয় শতকে মিশর ও সিরিয়ায় অস্থায়ী দূতাবাস ছিল। কৌটিল্যের পঞ্চসংস্থার (গুপ্তচর) মতো চীনদেশে গুপ্তচর (mysterious thread) সর্বত্র ছড়িয়ে থাকত।[৩] পারস্যের আকিমেনিদ বংশীয় রাজারা (খ্রি.পূ. ৫৫৯-৩৩০) রাজ্যের সর্বত্র বিশ্বস্ত গুপ্তচরের মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এদের বলা হতো 'King's eyes or ears or messengers.'[৪]

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লামেন পশ্চিম ইউরোপে ড্যানিউব নদী থেকে উত্তরে পিরেনিজ পর্বতশ্রেণি, রোম থেকে উত্তরে সমুদ্র পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। Aix-la-chapelle-তে শার্লামেনের রাজসভা ইউরোপের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। এই নবজাগরণ Carolingian renaissance নামে পরিচিত ছিল। শার্লামেনের গুপ্তচরদের বলা হতো মিসি (Missi), তারা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে সমস্ত খবর রাজাকে জানাত।[৫] বাইজানটাইন সম্রাটরা বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাতেন। তারা ওইসব দেশের গোপন খবর সংগ্রহ করে রাজাকে জানাত। একই সঙ্গে বিদেশি দূতদের ওপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখা হতো।[৬]

আরবের আব্বাসিদ বংশীয় রাজারা (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের কিছু অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাদের গুপ্তচর-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ। কোনো রাজ্য আক্রমণের আগে আব্বাসিদ রাজারা

সেখানে ছদ্মবেশী চর পাঠাতেন। চরেরা ঐ অঞ্চলের পথঘাট, অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, প্রজাদের মনোভাব ও সামরিক শক্তির খবরাখবর সংগ্রহ করত। এদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শত্রুরাজ্যের মানচিত্র তৈরি করা হতো। অনেক সময় জল ও স্থলবাহিনীর প্রধানরা আক্রমণের লক্ষ্যস্থল, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামরিক শক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে সমস্ত গুপ্তখবর সংগ্রহ করতেন।[৭]

কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার যুগেই সম্ভবত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল কূটনীতি।[৮] কিন্তু সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তার ফলে এই উন্নত নাগরিক সভ্যতার শাসনব্যবস্থা এবং আইন সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়।[৯] তবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় এই অঞ্চলে গুপ্তচর-ব্যবস্থা ছিল। রাজপ্রাসাদ, তরবারি, শস্ত্রধারী প্রহরীর বাসস্থান ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রমাণ করে যে একশ্রেণির কর্মচারী* নগর-সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকত।[১১]

---

* মর্টিমার হুইলার বলেন, 'a regimented block of cells discovered at Mahenjodaro might have been regarded variously as a priests' college with an adjacent temple and as a police station.'[১০]

বৈদিক যুগ

বৈদিক সাহিত্যে প্রথম গুপ্তচর-ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে দেবাসুরের দ্বন্দ্বে গুপ্তচর ব্যবহার করা হতো।[১২] বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি অর্থাৎ সব দেবতাদেরই চর ছিল। বরুণের চরদের বলা হয়েছে 'stars of the night'[১৩] and the 'beholders of men.'[১৪] দেবরাজ ইন্দ্রের চর কুক্কুরি সরমা প্রভুকে জানায় অসুররা দেবতাদের গোরু চুরি করে কোথায় রেখেছিল।[১৫] সরমার দুই পুত্র সারমেয় যমের চর ছিল।[১৬] ঋগ্‌বেদের একটি স্তোত্রে বরুণের এবং অগ্নির চরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] একটি প্রার্থনায় বরুণ ও অগ্নির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'চররা যেভাবে দূর থেকে সকলের ওপর নজর রাখে সেভাবে হে আদিত্য ও বরুণ, আপনারা আমাদের রক্ষা করুন।'[১৮] অন্যত্র যম যমীকে বলছেন, 'দেবতাদের চরেরা দিবারাত্রি সর্বত্র পাহারা দিচ্ছে (অন্যেন মদহনো অহি তুয়ানি তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্র)[১৯]। বরুণের চরদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। দিবারাত্রি তারা জল, স্থল, অন্তরীক্ষ বিচরণ করে গোপন খবর সংগ্রহ করত।[২০] সোম, মিত্র এবং পুষাণ প্রভৃতি দেবতাদেরও গুপ্তচর ছিল।[২১] এসব কাহিনি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে গুপ্তচররা শাসনব্যবস্থার এক প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে।

বৈদিক যুগের সূচনায় অসংখ্য ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। এসব রাজ্যের রাজারা গুপ্তচরদের মাধ্যমে শত্রুর গতিবিধির ওপর সর্বদাই নজর রাখত। অভ্যন্তরীণ শাসন সুপরিচালনা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুপ্তচররা সর্বত্র ভ্রমণ করে খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করত। যথাসময়ে রাজাকে তারা সব খবর জানাত। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে গুপ্তচরদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো, যথা স্পাশ,[২২] প্রাহিত[২৩], চার[২৪] (চরক), গূঢ়পুরুষ[২৫] এবং খোল।[২৬]

সুদূর অতীতেও চুরিডাকাতির মতো অপরাধ অজানা ছিল না। ঋগ্‌বেদে আমরা প্রথম চুরির উল্লেখ পাই।[২৭] নির্জন রাজপথে পথিকরা প্রায়ই দস্যুর কবলে পড়ত। অপরাধী শনাক্ত করে তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মূল্যবান দ্রব্য এবং গোধন উদ্ধারের জন্য রাজা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চর নিযুক্ত করতেন।[২৮] বৈদিক যুগে গোপন বার্তাবাহক এক শ্রেণির কর্মচারীকে বলা হতো পালাগল।[২৯]

ক্রমশ রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয় ও শাসনব্যবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। বহিরাক্রমণ এবং দেশের অভ্যন্তরে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, ভূসম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, শ্রেণিসংঘাত এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অসাধু ব্যবসায়ী এবং

উৎকোচ গ্রহণকারী রাজকর্মচারী রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে থাকে।[৩০] স্বভাবতই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য রাজা সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে থাকেন।[৩১]

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে গুপ্তচর-ব্যবস্থা আরও বেশি গুরুত্ব পায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রাজার প্রধান পারিষদবর্গ ব্রাহ্মণ, রাজা, প্রধান মহিষী, অন্তরঙ্গ মহিষী, পরিত্যক্ত পত্নী, সূত, সেনানী ও বার্তাবাহক (courier) নিয়ে গঠিত ছিল।[৩২] শতপথ ব্রাহ্মণে পালাগলকে (courier) বলা হয়েছে দূতের (sasanhara) অগ্রগামী। যজুর্বেদ থেকে জানা যায় সাধারণত জেলে, শিকারি, মাংসবিক্রেতা, রত্ন-ব্যবসায়ী, মালি, কামার, কুমোর, ছুতোর, পাহারাদার ইত্যাদি ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সৎ, সাহসী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমানদের গুপ্তচরবৃত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।[৩৩]

বৈদিক যুগের সূচনায় রাজার রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করত প্রধান পুরোহিত, পারিবারিক আইন, ব্যবসায়িক সংঘ এবং পৌরসংস্থা। কিন্তু রাজার শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজা সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি (Divine Right Theory) বলে ঘোষণা করেন। অভ্যন্তরীণ শাসন, সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্রনীতি এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচার বিভাগে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। প্রজাদের অভ্যন্তরীণ বিপদ ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য রাজা আরও অধিক সংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে গুপ্তচররা শাসনব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন রাজা এবং মন্ত্রী-পরিষদ।*

রামায়ণ-মহাভারতে গুপ্তচরকে রাজার 'চক্ষু-কর্ণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫] মহাভারতে শত্রুর খবর সংগ্রহের জন্য রাজাকে গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[৩৬] শান্তিপর্বে রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হয় তিনি যেন স্বদেশ ও প্রতিবেশী রাজ্যের উদ্যান, মঠ, মন্দির, জলাশয়, রাস্তা ও গলির মোড়, তীর্থস্থান, পানশালা, বিদ্বান ব্যক্তিদের আলোচনা সভা, সাধুদের আখড়া, বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বত, প্রত্যন্ত অঞ্চল—সর্বত্রই গুপ্তচর প্রেরণ করেন।[৩৭] মহাভারতে আরও বলা হয়েছে এই গুপ্তচররা ব্রাহ্মণ, পাষণ্ড (hypocrites), সিদ্ধ তাপস এবং বোবাকালার ছদ্মবেশে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে গুপ্ত খবর সংগ্রহে নিযুক্ত হবে।[৩৮] ভীষ্ম শিখণ্ডী রহস্য উদ্ধারের জন্য দ্রুপদ রাজার দেশে বোবাকালার ছদ্মবেশধারী গুপ্তচর প্রেরণ করেন। দ্রৌপদীকে নিয়ে পাণ্ডবরা যখন দ্রুপদ রাজ্য ত্যাগ করল তখন রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে তাদের অনুসরণ করে। যে গৃহে পাণ্ডবরা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের চরেরা সজাগ দৃষ্টি রাখে।[৩৯] এই চরেরা পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করেছিল।

---

* As the brain cannot function without the instrumentality and co-operation of a number of sense organs, so also the king-in-council required the assistance of several departments among which espionage was vital.[৩৪]

রাজা ভরতকে রাজ্যভার অর্পণের সময় রাম তাকে রাজকার্য সম্পর্কে উপদেশ দানকালে বলেন যে গুপ্তচর মারফত রাজ্যের সমস্ত খবর সংগ্রহ করা রাজার সাফল্যের মাপকাঠি।[৪০] রাম-রাবণের যুদ্ধের আগে উভয়পক্ষ থেকেই চর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু মারীচ ও রাবণের কনিষ্ঠ ভগ্নী শূর্পনখা রাবণের চরব্যবস্থা দুর্বল বলে মন্তব্য করেন। সীতাহরণ কালে রাবণ মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে সতর্ক করে বলেন যে রাবণের গুপ্তচররা জানে না যে রাম বরুণ ও মহেন্দ্রের মতো যোগ্য ও বুদ্ধিমান।[৪১]

মহাভারতের শান্তিপর্বে[৪২] উল্লেখ আছে কালকবৃক্ষীয় নামক সাধু রাজা ক্ষেমদর্শীর গুপ্ত খবর সংগ্রহের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে ঐ রাজ্যে গমন করেন। তার সঙ্গে ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি কাক। রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে কালকবৃক্ষীয় আবিষ্কার করলেন যে রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। রাজার কোষাগার থেকে তারা বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করে রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছে। রাজার কাছে কালকবৃক্ষীয় তার রাজকর্মচারীদের দুর্নীতির খবর জানালেন। রাজা এইসব অসৎ রাজকর্মচারীদের বিতাড়িত করেন।

পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন যে একজন সুশাসকের উচিত শত্রুরাজ্যে গুপ্তচরদের সহায়তায় রাজকর্মচারীদের বশীভূত করে শত্রুর গোপন খবর সংগ্রহ করা।[৪৩] নিজের রাজ্যে প্রজার সুরক্ষা ও সুশাসনের জন্য রাজার উচিত বিশ্বস্ত গুপ্তচর ও সুদক্ষ রাজকর্মচারী নিয়োগ করা।[৪৪] নগররক্ষীদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা উচিত নয়। একজন আদর্শ রাজার কর্তব্য গুপ্তচর মারফত শত্রুদেশে বিভেদ সৃষ্টি করা, শত্রু, মিত্র, সামন্ত সকলের ওপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা, ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে জনমত সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং নিয়মিতভাবে গুপ্তচরদের সততা পরীক্ষা করা। 'With spies constituting his sight, the king should ascertain all the acts and intentions of his friends, foes and neutrals.'[৪৫]

ভবভূতি *উত্তররামচরিত* নাটকের প্রথম অঙ্কে উল্লেখ করেন সীতার সতীত্ব সম্পর্কে প্রজাদের মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য রাম দুর্মুখ নামক চরকে নিযুক্ত করেছিলেন।[৪৬] ভর্তৃহরির *ভট্টিকাব্য*, মাঘ রচিত *শিশুপালবধ*, ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহারম* এবং *কিরাতার্জুনিয়ম* ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে।*

---

* 'Statecraft does not succeed without spies even if one takes no steps outside the sacred texts and pays handsome allowances to his assistants.'[৪৭]

বৌদ্ধ যুগ

খ্রি.পূ. ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে দুই প্রতিবাদী মতবাদের অভ্যুত্থান হয়। এ দুটি জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ঐ সময় ভারতবর্ষে কোনো একক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ *অঙ্গুত্তরনিকায়*[৪৮] এবং জৈনগ্রন্থ *ভগবতী*[৪৯] *সূত্র* থেকে আমরা উত্তর ভারতে ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ পাই। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও কাশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুপ্তচর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। এদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে।[৫০] খ্রি.পূ. পঞ্চম শতাব্দীতে ভাস রচিত *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ* গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কোশাম্বীরাজ বৈদেহীপুত্রর পুত্র উদয়নের সুদক্ষ গুপ্তচরের উল্লেখ আছে।[৫১] খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অশ্বঘোষ *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থে লিখেছেন, শাক্যরাজা শুদ্ধোধন সহস্র কর্মঠ ও সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করেন। রাজপুত্র গৌতম যাতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করতে না পারেন তার জন্য তারা সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখত। কিন্তু এই সতর্ক প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গৌতম এক গভীর রাতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন। রাজা মন্ত্রীপরিষদ ও প্রধান পুরোহিতদের পরামর্শে রাজপুত্রের সন্ধানে ছদ্মবেশী চর পাঠান। তারা গৌতমকে খুঁজে বের করে। কিন্তু তিনি প্রাসাদে ফিরে যাবার সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।[৫২]

প্রাচীনকালে গুপ্তচররা ছিল যথার্থই সৎ এবং যোগ্য। প্রকৃত অর্থে তারা ছিল রাজার চক্ষু, কর্ণ। স্বয়ং বুদ্ধ গুপ্তচরকে শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে বিবেচনা করেন।* বিভিন্ন প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় গুপ্তচর নিযুক্ত করলেও প্রকৃত ধার্মিক রাজা রাজ্য এবং প্রজাদের সঠিক অবস্থা জানবার জন্য ভ্রমণে বেরোতেন। মাঝে মাঝে তারা ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। মহাভারত থেকে জানা যায় যে একবার বৎস্য রাজ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজা পরপর তিনদিন তিনরাত্রি রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে প্রজাদের দুর্দশা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।[৫৪]

বৌদ্ধজাতকেও আমরা এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ পাই। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত তার

---

* 'The king should base his daily life upon the single principle (ekadhammo) of watchfulness (appamudo) for he would thereby keep himself active and wakeful and guarded along with the family members and vassal kings and would guard and protect his treasure and storehouse.'[৫৩]

শাসনব্যবস্থার ত্রুটি প্রত্যক্ষ করার জন্য ছদ্মবেশে নগর, গ্রাম এমনকি হিমালয় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করতেন।[৫৫] *গণ্ডতিন্দুজাতক* থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে পাঞ্চাল রাজ্যে একজন রাজার মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে ওঠে। প্রজারা করভারে জর্জরিত হয়। চোরডাকাতের ভয়ে সাধারণ মানুষ তটস্থ হয়ে ওঠে। এসব কথা শোনার পর রাজা এবং তার প্রধান পুরোহিত ছদ্মবেশে সমস্ত ঘটনার সত্যতা যাচাই করে যথার্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।[৫৬]

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধজাতক ইত্যাদি অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে গুপ্ত খবর সরবরাহের জন্য পায়রা, ময়না, শুক, তোতা প্রভৃতি পাখি এমনকি কাককেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। *মহাউন্মার্গ* জাতক কাহিনি থেকে জানা যায় উত্তর পাঞ্চালরাজ ব্রহ্মদত্ত যখন মন্ত্রী কৈবর্তর সাথে সমস্ত জম্বুদ্বীপ জয়ের পরিকল্পনা করছেন সেই সময় মিথিলার অধিপতি একটি শুকপাখি মারফত খবরটি জানতে পারেন।[৫৭] পাণ্ড্যরাজ্যের রাজা ছিলেন পারি। তিনশত গ্রাম-অধ্যুষিত পাণ্ড্যরাজ্য চারপাশেই ছিল পাহাড়ে ঘেরা। অঞ্চলটি ছিল উর্বর এবং পারি তার রাজ্যরক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি তামিল কবি কপিলারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে কপিলার অনেকগুলি তোতাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। পারির রাজ্য তিনজন তামিল রাজার দ্বারা আক্রান্ত হলে কপিলারের তোতাবাহিনী আশপাশের গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য এনে অবরুদ্ধ দুর্গে জমা করেছিল।[৫৮] এসব কাহিনিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গুপ্ত রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত যবনদের বিরুদ্ধে জয়লাভের বার্তা পায়রা মারফত পিতা মহারাজ কুমারগুপ্তের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। বাগদাদের খলিফাদের সুশিক্ষিত পায়রাবাহিনী ছিল।[৫৯] ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই-লা-স্যাপেল থেকে ব্রাসেলসে পায়রার মাধ্যমে গুপ্ত সংবাদ পাঠানো হয়।[৬০] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রা ব্যবহার করা হতো। মার্কিন সেনাবাহিনীর অত্যন্ত সুশিক্ষিত পায়রা 'শের আমি' যেভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনীকে (Lost Battalion) উদ্ধার করেছিল তা সত্যিই চাঞ্চল্যকর।[৬১] বহু পূর্বে ইংলন্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড (১১৮৯-৯৯) সিরিয়া ও আরব মরুভূমির যাযাবর জাতি সারাসেনিদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। পায়রা মারফত সারাসেনিরা রিচার্ডের সামরিক শক্তির খবর সংগ্রহ করে।[৬২] ইন্ডিয়ান পুলিশ জার্নাল[৬৩] থেকে জানা যায় জার্মানির বিখ্যাত ব্যাংক ব্যবসায়ী রথচাইল্ড (১৭৪৩-১৮১২)-এর ভিয়েনা, লন্ডন, নেপলস্ ও প্যারিসে ব্যাংকের শাখা ছিল। পায়রা মারফত বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে যোগাযোগ রাখা হতো। এ ছাড়াও নেপোলিয়নের আক্রমণকালে ব্যাংকের বাড়িগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য ব্যাংককর্মীরা পায়রা মারফত নেপোলিয়নের গতিবিধির খবর সংগ্রহ করত। পায়রা মারফত ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতনের খবর সংগ্রহ করা হয়েছিল। পায়রার শরীরে স্বয়ংক্রিয় ছোটো ক্যামেরা বসিয়ে শত্রুরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তোলা হয়।* ভারতীয় পুলিশবাহিনীতেও

---

* 'They were also used in espionage work bringing information about location of vital enemy installations. They flew against many odds like gunfire and faithfully undertook their missions....' (IPG xxxix, 1983, p. 34)

pigeon service-এর কথা শোনা যায়। দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অভিযানের সময় পুলিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রা মারফত সদর দপ্তরে বার্তা প্রেরণ করে। অনেক সময় দুটি পায়রাকে একই খবর দিয়ে পাঠানো হয়। শিকারি পাখির কবলে পড়লে দুটির মধ্যে একটি পায়রা সংকেত বুঝে গতিপথ পরিবর্তন করে।

পায়রা দ্রুতগামী পাখি। ১৯৪৮ সালের ১৩ এপ্রিল জওহরলাল নেহরু সম্বলপুর থেকে কটকের পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলকে পায়রা মারফত একটি খবর পাঠান। ভোর ছটায় ঐ গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে পায়রাটি ২৯২ কিমি পথ অতিক্রম করে বেলা ১১.২০-তে খবর যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। ১৯৫৪ সালে দিল্লিতে ভারতীয় ডাকবিভাগের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসবে ওড়িশার pigeon service সবাইকে চমৎকৃত করে। ঐ সময় রাষ্ট্রপতির ভাষণ পায়রার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও পায়রা ঠিক সময়েই খবরটি পৌঁছে দেয়। প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া নিয়মিত কবুতর মারফত খবর আদানপ্রদান করত। ফুলবাড়ি ও কালাহান্দি জেলার পাহাড়ি ও জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় পায়রাকে সংবাদবাহকরূপে ব্যবহার করা হতো। ঐ সময় বিধানসভা নির্বাচনে পোলিং বুথ থেকে অফিসাররা নির্বাচনী খবর কেন্দ্রে পায়রার মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন।[৪] ১৯৮০ সালের ২২ জুলাই স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে একদল চোরাকারবারী পায়রা মারফত নিয়মিত সোনা পাচার করত। ৬.১১.৮৪-তে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি আকর্ষণীয় খবর প্রকাশিত হয়।

খবরটির শিরোনাম— 'Pigeons Prime Need in Spain's Defence'

স্পেন সরকার একটি আইন দ্বারা ঘোষণা করে যে বিনা লাইসেন্সে শুধু শখের জন্য পায়রা পোষা চলবে না। প্রতিরক্ষা বিভাগের অনুমতি নিয়ে পায়রা প্রজননকারীরা পায়রা পুষতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা জরুরি অবস্থায় পায়রাগুলিকে প্রতিরক্ষা দপ্তরে জমা দিতে হবে। আইন দ্বারা স্পেনে পায়রা শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। কেউ যদি কোনো দলছুট পায়রা কুড়িয়ে পায় তবে তাকে নিকটস্থ পুলিশ পোস্ট অথবা মিলিটারি পোস্টে জমা দিতে হবে।

পায়রা ছাড়া ময়না, শুক ইত্যাদি পাখি মারফত খবর আদানপ্রদানের কথা জানা যায়। ১৯৮৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাস শহরের একটি বাড়িতে একদল ডাকাত ঢোকে। বাড়িতে কেউ ছিল না। কিন্তু পোষা ম্যাকাও পাখিটি ছিল। ডাকাতদের কথাবার্তায় সে তাদের নামধাম জেনে ফেলে। পরে পুলিশের কাছে ম্যাকাও পাখি ডাকাতদের নামপ্রকাশ করে দেয়। সাম্প্রতিককালের এসব ঘটনা প্রমাণ করে প্রাচীন পুঁথিপত্রের বিবরণ মিথ্যে নয়।

পাখি ছাড়া উট, ঘোড়া, হাতি ও কুকুর বার্তাপ্রেরণের কাজে এবং কুকুরকে বিশেষত অপরাধী শনাক্তকরণে ব্যবহার করা হতো। আরবে ঘোড়া ও উটকে বার্তাবহনের কাজে লাগানো হতো।[৫] ভারতেও সংবাদপ্রেরণের জন্য ঘোড়া ও উটের ব্যবহার ছিল। কথিত

আছে বারাণসীরাজ দৃঢ়বর্মার একটি শক্তিশালী বৃহদাকার উট ছিল। রাজা, ঐ উট মারফত বিশ্বস্ত বার্তা পাঠাতেন। উটের গলায় ঐ বার্তা বেঁধে পাঠানো হতো। এই উট একদিনে একশত যোজন পথ অতিক্রম করত এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।[৬]

ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে অপরাধী শনাক্তকরণে কুকুর ব্যবহার করা হতো। বিভিন্ন জাতক কাহিনিতে আছে গুপ্তচররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করত। *মহাবোধি জাতক* থেকে জানা যায় এক প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী একজন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন বলে রাজার পারিষদবর্গ ঈর্ষান্বিত হয়ে গোপনে ঐ সন্ন্যাসীকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটি কুকুর ঐ সন্ন্যাসীর জীবন রক্ষা করে।[৭] প্রাচীন ভারতে অনেক রাজা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখতেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে তাঁকে একজন ভারতীয় নৃপতি সৌভূতি তাঁর শক্তিশালী কুকুর প্রদর্শন করেন।*

---

* .... the strength and tenacity of the hunting dogs.... impressed the European more than anything else.'[৮]

ঐতিহাসিক যুগ

(খ্রি.পূ. চতুর্থ-দ্বাদশ শতক)

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্য বিস্তারের যুগে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরসংস্থা সুদক্ষ, সুনিয়ন্ত্রিত ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। মৌর্য শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকরা মৌর্যযুগকে গুপ্তচরের সুবর্ণযুগ বলে আখ্যা দেন। সমসাময়িক গ্রিক এবং ভারতীয় লেখকদের বিবরণ থেকে আমরা মৌর্যযুগের গুপ্তচর-ব্যবস্থার কথা জানতে পারি। মেগাস্থিনিস, স্ট্রাবো, ডিওডোরাস ও অ্যারিয়ান প্রমুখ গ্রিক ভ্রমণকারীগণ ভারতীয় গুপ্তচরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলুকসের দূত মেগাস্থিনিস খ্রি.পূ. ৩০৫-২৯৭ অব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি বলেন, গুপ্তচর* প্রকৃতপক্ষে রাজার চক্ষু-কর্ণ। এরা রাজাকে স্বাধীন উপজাতি-প্রধানদের কার্যকলাপ এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্ত ঘটনার খবর জানাত।[১০]

স্ট্রাবো (খ্রি.পূ. ৬৩-১৯ অব্দ), ডিওডোরাস (খ্রি.পূ. ৬০-৩৬ অব্দ) এবং অ্যারিয়ান (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি) ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় 'episcopoi' নামে এক শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ করেছেন। Episcopoi-এর আক্ষরিক অর্থ 'one who watches' অর্থাৎ 'গুপ্তচর'।[১১] ডিওডোরাস গুপ্তচরদের 'Ektor' অর্থাৎ 'overseers' বলে বর্ণনা করেন। এদের কাজ ছিল রাজ্যের গোপন খবর রাজাকে সরবরাহ করা।[১২] অ্যারিয়ান গুপ্তচরদের 'superintendents' বলে উল্লেখ করেন। তিনি ভারতীয় গুপ্তচরদের কর্মতৎপরতা এবং সততার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৩]

দেশীয় লেখকদের মধ্যে কৌটিল্য (চাণক্য) (খ্রি.পূ. ৩২১-৩০০ অব্দ) রচিত অর্থশাস্ত্র গুপ্তচর সম্পর্কে একটি অসাধারণ প্রামাণ্য গ্রন্থ।[১৪] মহানবীশ টীকায় কৌটিল্যকে তক্ষশীলার অধিবাসী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫] কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মগধের নন্দবংশ ধ্বংস করে আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩২১ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন।[১৬] কৌটিল্য বা চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ফ্লোরেনটাইন কূটনীতিবিদ ও স্টেটসম্যান ম্যাকিয়াভেলির (১৪৯৮-১৫১২ খ্রি.) মতো

---

* J. W. Mecrindle তাঁর 'Ancient India as described by Megasthenes and Arrian' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'The spies go out to see what goes on in country and town and report everything to the king where the people have a king, and to the magistrate where the people are self-governed and it is against use and won't for these to give in a false report, but indeed no Indian is accused of lying.'

কৌটিল্য বিশ্বাস করতেন, রাজনীতিতে সাফল্যের প্রধান হাতিয়ার কূটনীতি ও প্রতারণা ; ন্যায়নীতির কোনো স্থান সেখানে নেই। ঐতিহাসিকরা অনেক সময়ে কৌটিল্যকে প্রাচ্যের ম্যাকিয়াভেলি আখ্যা দিয়ে থাকেন। মৌর্য পরবর্তী যুগে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনপ্রণেতা ছিলেন মনু (খ্রি.পূ. ২০০ অব্দ)। তার অনুগামী ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য[৭৭], নারদ[৮], বৃহস্পতি[৯], বিষ্ণু[৮০] এবং মার্কণ্ডেয়[৮১]। এঁরা সকলেই রাষ্ট্রীয় শাসনে গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। পরবর্তীকালে যে সব লেখক গুপ্তচর সম্পর্কে আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামণ্ডক[৮২]। তিনি নীতিসার গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়া বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*[৮৩] (political drama), দন্ডিন-এর *দশকুমারচরিত*[৮৪], লক্ষ্মীধরের *কৃতকল্পতরু*[৮৫], রাজা তৃতীয় সোমেশ্বরের *মানসোল্লাস*[৮৬], কলহনের *রাজতরঙ্গিণী*[৮৭], *শুক্রনীতিসার*[৮৮] *পুরাণ*, *কথাসরিৎসাগর* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রাজারা গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত খবর সংগ্রহ করতেন।

দেশিবিদেশি সমস্ত গ্রন্থে রাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গুপ্তচর-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পরোক্ষভাবে রাজার নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে গুপ্তচরদের সতর্ক থাকতে হতো। যে কোনো বিপদ থেকে রাজাকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হতো। কৌটিল্যের মতে, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকলে রাজা প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন।[৮৯] মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেন রাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য নারী-প্রহরী নিযুক্ত হতো।[৯০] স্ট্রাবো বলেছেন রাজার ব্যক্তিগত পরিচর্যার জন্য কিছু পিতামাতা কন্যাসন্তান বিক্রি করতেন।[৯১] ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে রাজা সবসময় সতর্ক থাকতেন। গুপ্তহত্যার আশঙ্কায় প্রতি রাতে রাজা শয়নকক্ষ পরিবর্তন করতেন।[৯২] রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত। প্রাসাদের বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা বিচারসভায়, মন্দিরে এবং শিকারে—রাজা যেখানেই যান না কেন তাঁকে ঘিরে থাকত শস্ত্রধারী রমণী এবং বর্শাধারী প্রহরী। রাজা প্রাতঃকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বিশ্বস্ত রমণীরা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত হতো।[৯৩]

রাজরন্ধনশালা ছিল খুবই সুরক্ষিত। রাজার আহার্য, পরিবেশনের পাত্র বিষমুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য খাদ্যবিশেষজ্ঞ ও পরীক্ষক নিযুক্ত থাকত।[৯৪] রাজার প্রসাধন সামগ্রী, পরিধেয় পোশাক, অলংকার ইত্যাদি 'অন্তরবংশীক' নামক কর্মচারীরা ভালোভাবে পরীক্ষা করে তা রাজাকে ব্যবহারের অনুমতি দিতেন। পরিচারিকা, রাজার কেশ প্রসাধনকারী, শয্যাপ্রস্তুতকারী, ধোপা, নাপিত এবং মালাকারদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা হতো।[৯৫]

রাজার ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পালকি, রথ, ঘোড়া এবং নৌকা বিশ্বস্ত কর্মচারীরা পরীক্ষা করে দেখতেন। রাজার স্নানের জন্য নির্দিষ্ট জলাশয়, বিহারের উদ্যান সবসময় নিরাপদ রাখার জন্য কঠোর নির্দেশ থাকত। রাজার চিত্ত-বিনোদনের জন্য যেসব অনুষ্ঠান হতো তাতে নর্তক বা বাদক এবং অভিনেতার দল অস্ত্র, আগুন এবং বিষ ব্যবহার করতে পারত না। এদের বাদ্যযন্ত্র, ঘোড়া বা হাতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে রেখে পরীক্ষা

করার ব্যবস্থা ছিল।[৯৬] এককথায়— আহারগ্রহণকালে, সাক্ষাৎকারের সময় এমনকি স্নানের সময়, পোশাক এবং অলংকার পরার সময়, উৎসব অনুষ্ঠানে রাজার সুরক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। কারণ, রাজা সুরক্ষিত থাকলে রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবেন।[৯৭] প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিবিদরা সে কারণেই রাজার সুরক্ষার ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করতেন। পরবর্তীকালে লক্ষ্মীধর (১১০০-১১৩০ খ্রি.) *কৃত্যকল্পতরু* গ্রন্থে কৌটিল্যের মতোই রাজার সুরক্ষার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদানের পরামর্শ দেন।[৯৮]

রাজা যখন রাজধানীর বাইরে থাকতেন অথবা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, সাধু সন্ত বা বিদেশি দূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং সামরিক বাহিনীর সমরসজ্জা পরিদর্শন করতেন তখন তাকে সশস্ত্র প্রহরীরা ঘিরে থাকত। উৎসব-অনুষ্ঠান, যাত্রা বা যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করার সময়ও রাজা* প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকতেন।

কৌটিল্য এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ রাজাকে সতর্ক করে দেন যে তিনি যেন রাজপরিবারের সদস্য, রাজপুত্র এমনকি রাজমহিষীর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করেন। কৌটিল্য বলেছেন বিশ্বস্ত বৃদ্ধা পরিচারিকা দিয়ে রানিকে পরীক্ষা করে রাজা রানির শয়নকক্ষে প্রবেশ করবেন।[৯৯] রাজ-অন্তঃপুরের বিভিন্ন মহিলা ও মহিষীদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য কৌটিল্য বিশ্বস্ত প্রবীণ পুরুষ ও রমণী এবং খোজা প্রহরী নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে অপরিচিত সাধুসন্ত, বাইরের পরিচারিকা, ভাঁড় এবং অভিনেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাজা অনেক সময় রানির ষড়যন্ত্রের শিকার হতেন। সে কারণেই কৌটিল্য বাইরের লোকের সঙ্গে রানির মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ভদ্রসেনের মহিষীর সঙ্গে রাজার ভ্রাতার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। রানির শয়নকক্ষে লুকিয়ে থেকে রাজা ভদ্রসেনের সহোদর ভ্রাতা রাজাকে হত্যা করেন। এই অবৈধ সম্পর্কের জেরেই রাজা বৈরন্ত রানির হাতের বিষমাখানো কঙ্কনের আঘাতে নিহত হন। রাজা জালুককে রানি একটি বিষমাখানো কাচ দিয়ে হত্যা করেন। রাজা বিদুরথ মহিষীর চুলের বেণীতে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন। রাজা করুসের পুত্র মায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার বিছানার নীচে লুকিয়ে থেকে পিতৃহত্যা করেন। (RGM.xx, Sham Sastri i.xx. R.G. B-p 27-28)

প্রাসাদ সুরক্ষার জন্য কৌটিল্য উচ্চদীর্ঘ মজবুত প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা ঘেরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে গুপ্তকক্ষ ও সুড়ঙ্গ নির্মাণ, প্রাসাদের গুপ্তকক্ষে অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখার পরামর্শ দেন। বিপদকালে সুড়ঙ্গপথে বাইরে যাবার সময় কৌটিল্য প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করতে বলেন।[১০১] পরবর্তীকালে শুক্র এই একই পরামর্শ দেন।[১০২] যথা, প্রাসাদে সর্বদাই বিশ্বস্ত ও সতর্ক প্রহরীরা দিবারাত্রি নিযুক্ত থাকবে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে কোথাও বিষ থাকলে তা শনাক্ত করার জন্য বিড়াল, ময়ূর, বেজি, ময়না, তিতির প্রভৃতি পাখি এবং হরিণ (spotted dear) পোষার কথাও বলা হয়েছে।[১০৩]

---

* 'Just as he attends to the personal safety of others through the agency of spies, so a wise king shall also take care to secure his own safety from external danger.'[১১]

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কৌটিল্য গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজপুত্রদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন। অনেক সময় রাজপুত্র রাজা এবং রাজ্যের বিপদের কারণ হয়ে উঠতেন। মগধরাজ বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের একটি মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : '.... the princes like crabs have a notorious tendency to eat up their begetters.' (AS/KS-Ed. and Trans. by R. Sham Sastri and R. P. Kangle) ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পরাশর, পিষুণ, কৌনপাদ এবং বাতব্যাধি রাজপুত্রদের আচার-আচরণ ও মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করার পরামর্শ দেন।[১০৪]

কৌটিল্য বিপথগামী রাজপুত্রদের সংশোধনের জন্য সত্রী নামক গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দেন। যেসব রাজকুমার নারী, সুরা, জুয়াখেলা ও শিকারে অত্যধিক আসক্ত হয়ে উঠত তাদের সংশোধনের জন্য কৌটিল্য গুপ্তচর মারফত কয়েকটি কৌশল প্রয়োগের কথা বলেছেন।[১০৫] উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল রাজপুত্রকে সংশোধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই শ্রেয় বলে কৌটিল্য মনে করেন। অনেকে আবার বিপথগামী রাজপুত্রকে নির্বাসন দিতে বলেছেন। কৌটিল্য এ মতের বিরোধিতা করে বলেন নির্বাসিত উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল রাজপুত্র কুসংসর্গে পড়ে অসদুপায়ে প্রচুর অর্থসংগ্রহে প্রয়াসী হতে পারে। অনেক সময় পিতৃরাজ্যের শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পিতৃরাজ্য আক্রমণ করে তা বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে রাজার সুরক্ষা ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য অবাধ্য, অসৎ এবং দুর্বিনীত রাজপুত্রকে গুপ্তচর মারফত হত্যা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। তবে কৌটিল্য এই গুপ্তহত্যাকে নিষ্ঠুর ও নীতিবিগর্হিত কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা ভারতবর্ষ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে বিপথগামী রাজপুত্রকে হত্যা করার নজির পাই।

গুপ্তচরের মতো রাষ্ট্রীয় শাসননীতি* ও আইনের গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কৌটিল্য প্রমুখ কূটনীতিবিদগণ। কৌটিল্য বলেন রাজা অত্যন্ত নিভৃত স্থানে মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সাথে সরকারি নীতি আলোচনা করবেন ; এমনকি ঐ স্থানে কোনো পশুপাখি রাখাও নিরাপদ নয়।[১০৭] কথিত আছে, পদ্মাবতীর নাগবংশীয় রাজা নাগসেনের গোপন নীতি ফাঁস করে একটি ময়না তার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে। শ্রাবস্তীরাজ শ্রুতবর্মণের গোপন নীতি একটি তোতাপাখি প্রকাশ করে দেয়। শ্রুতবর্মণের এতে ভাগ্য বিপর্যয় হয়।[১০৮] এই প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় ২৩.১.৮৪-তে প্রকাশিত ঘটনাটি (আগে উল্লেখ করেছি) মনে পড়ে যায়। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে মন্ত্রণাসভায় আলোচিত সরকারি নীতি কেউ যাতে প্রকাশ না করে ফেলে তার জন্য রাজাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হতো। অনেক সময় ঘুমের ঘোরে মত্ত অবস্থায় অথবা প্রেমিকার কাছে কেউ কেউ সব কথা বলে

---

* 'Counsel has six doors, viz. one's self (atma), the minister and the messenger, a secret agent, the practice of the three oblations and the onward expressions of men....'[১০৯]।

ফেলত। মৃত্তিকাবতীর রাজা সুবর্ণসুদ ঘুমের ঘোরে তার রাষ্ট্রনীতির গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন। ফলে তার শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল।[১০৯] তাই মনু, কামশুক, যাজ্ঞবল্ক্য, সরকারি নীতির গোপনীয়তা রক্ষার ওপর জোর দেন।[১১০]

বেদ, পুরাণ, প্রাচীন দেশিবিদেশি বিবরণ, মহাকাব্য এবং অন্যান্য গ্রন্থে গুপ্তচরের উল্লেখ থাকলেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে আমরা গুপ্তচর ব্যবস্থার সুসংহত রূপ দেখতে পাই। কৌটিল্য[১১১], মনু[১১২] এবং শুক্রাচার্য[১১৩] রাজার সান্ধ্য-উপাসনার পরে গুপ্তচরদের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছেন। ঐ সময় রাজা চরের কাছে সমস্ত খবর সংগ্রহ করতেন। রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে গুপ্তচর রাজার কাছে তা প্রকাশ করত। রাজা তখন নিজেকে সংশোধনের প্রয়াস পেতেন। এভাবে প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রাদর্শ রূপায়ণে গুপ্তচরের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

কৌটিল্য শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতি বিভাগে গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দেন। মন্ত্রী নির্বাচনকালে রাজা গুপ্তচর দ্বারা তাদের সততা ও কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করতেন আবার গুপ্তচরদের নিযুক্ত করার সময় মন্ত্রীর (tried under espionage) পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[১১৪] কৌটিল্য গুপ্তচরদের কপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিক, বৈদেহক, তাপস, সত্রী, তীক্ষ্ণ, রসদ ও ভিক্ষু এই নয়টি ভাগে ভাগ করেন। প্রথম পাঁচশ্রেণির চর 'পঞ্চসংস্থা' ও শেষের চারশ্রেণি 'সঞ্চার' নামে পরিচিত ছিল।[১১৫] কৌটিল্য বর্ণিত 'পঞ্চসংস্থা'র মতো প্রাচীন চীনে গুপ্তচর-সংস্থা ছিল। স্থানীয় চর (স্থানীয় জেলা থেকে নিযুক্ত), শত্রুর কর্মচারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত চর (inward spies), বিজিত রাজ্য থেকে বিজেতা যে সব চর (converted spies) নিযুক্ত করতেন, মিথ্যে খবর দিয়ে সেসব চর (doomed spies) শত্রুকে প্রতারণা করত এবং শত্রুর গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী (surviving spies) চর নিয়ে গঠিত হতো প্রাচীন চীনের গুপ্তচর সংস্থা (mysterious thread).[১১৬]

কৌটিল্য বর্ণিত 'পঞ্চসংস্থা' সমাহর্তা নামক রাজকর্মচারীর অধীনে ছিল। 'সঞ্চার' (wandering spies) স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করত। বিভিন্ন শ্রেণির নারী গুপ্তচরের কথা উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য।[১১৭] গায়িকা, নর্তকী, অভিনেত্রী, পরিব্রাজিকা বা মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসিনীরা গুপ্ত খবর সংগ্রহে নিযুক্ত হতো। অধিকাংশ মহিলা চর ছিল বৃষলি (sex workers)। ঐতিহাসিক এইচ. সি. রায়চৌধুরী *ভগবজ্জুকিবম্* এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* বৃষলি বা গণিকার উল্লেখ পেয়েছেন। অভিনেত্রী, গণিকা এবং নর্তকীদের মধ্যে যারা গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হতো তাদের বিভিন্ন ভাষা এবং সাংকেতিক ভাষায় (গূঢ়লেখ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। দুষ্কৃতী ও বিদেশি চরদের প্রতারণা করার জন্য নারী গুপ্তচর ব্যবহার করা হতো। গণিকালয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিল গণিকাধ্যক্ষ। যৌনকর্মীদের কাছে যারা আসত তাদের ওপর সর্বদাই রাখা হতো কড়া নজর। এভাবে অনেক সময় অপরাধীদের শনাক্ত করা হতো।

কৌটিল্যের মতো মনুও গুপ্তচরদের কপটিক, উদাস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহকব্যঞ্জন

এবং তাপসব্যঞ্জন— এ ভাবে ভাগ করেন।[১১৮] তিনি গুপ্তচরদের জন্য আটটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন। কৌটিল্যও গুপ্তচরদের ভাগ করে তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করেন :

কপটিক— সহজেই মনুষ্যচরিত্র বুঝতে পারে এ ধরনের বাকপটু একশ্রেণির গুপ্তচরকে বলা হতো কপটিক। এরা ছিল বিশ্বস্ত। রাজা এদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে গুপ্ত খবর সংগ্রহে নিযুক্ত করতেন।

উদাস্থিত— প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন সৎ চরিত্রের সাধুরা অনেক সময় গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করত। এদের বলা হতো উদাস্থিত। রাজা প্রচুর অর্থ দিয়ে উদাস্থিত নামক চরদের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে পশুপালন, কৃষিকার্য বা ব্যবসায় নিযুক্ত করতেন। এদের সঙ্গে থাকত সাধুবেশী অন্যান্য চর। চাষ, ব্যবসা বা পশুপালন করে যে অর্থ উদ্‌বৃত্ত হতো তাতে এরা দরিদ্র বৌদ্ধ, জৈন বা পাশুপাতদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করত। উদাস্থিত এবং তার কপট শিষ্যদল এদের রাজার কোষাগার লুণ্ঠনকারী এবং অন্যান্য অপরাধী শনাক্তকরণে নিযুক্ত করত।

গৃহপতিক— দরিদ্র অথচ সৎ, বুদ্ধিমান একশ্রেণির কৃষক গুপ্তচরের কাজ করত। রাজা এদের জন্য চাষের জমি নির্ধারিত করতেন। বিশ্বস্ত কিছু দরিদ্র চাষি নিয়ে চাষ করার সময় গৃহপতিক নানারকম গুপ্ত খবর সংগ্রহ করত। দরিদ্র ব্যবসায়ীরাও অনেক সময় গৃহপতিকদের মতো গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত হতো।

তাপস— মুণ্ডিতমস্তক অথবা জটাধারী ব্যক্তি অনেক সময় জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধুর ছদ্মবেশে গুপ্তচরের কাজ করত। সাধুবেশী চর একদল ভেকধারী শিষ্য নিয়ে নগরপ্রান্তে অস্থায়ী আখড়া বানিয়ে অবস্থান করত। ভেকধারী চেলারা গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করার ফলে দলে দলে লোক সাধুদর্শনে আসত। আগে থেকেই যারা আসত চেলারা তাদের খোঁজখবর নিত। এদের সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আসতেন। কপট সাধু নানারকম ভবিষ্যদ্‌বাণী করে সকলের মন জয় করে নিত। এদের আস্থা অর্জন করে কপট সাধু কৌশলে রাজার প্রতি সকলের মনোভাব জেনে নিত। যারা রাজার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করত তাপস তাদের রাজার কাছ থেকে অর্থ ও সম্মানলাভের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে রাজার কাছে প্রেরণ করত। তাপসের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রী রাজাকে এ সব ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করার জন্য অর্থ দেবার অনুরোধ জানাতেন। রাজা এদের অর্থ ছাড়াও সম্মানিত করে মন জয় করতেন। বিদ্রোহী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের তাপস গোপনে হত্যা করার ব্যবস্থা করত।[১১৯]

'পঞ্চসংস্থার' অন্তর্ভুক্ত গুপ্তচররা উচ্চ বেতন লাভ করত। এদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। এরা রাজার কর্মচারী এবং পারিষদবর্গের ওপর নজর রাখত এবং যথাসময়ে রাজাকে সমস্ত খবরই সরবরাহ করত।[১২০]

সত্রী, তীক্ষ্ণ, রসদ এবং পরিব্রাজিকা— এই চারশ্রেণির গুপ্তচরকে বলা হতো 'সঞ্চার'।[১২১]

সত্রী— সে যুগে অনাথদের প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে বুদ্ধিমানদের হস্তরেখা বিচার, যাদুবিদ্যা, হাত সাফাই প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত। আবার কেউ নৃত্যগীতে পারদর্শী হয়ে উঠত। এরা গুপ্তচরের কাজ করত। এদের বলা হতো সত্রী।

তীক্ষ্ণ— যে সব হঠকারী বেপরোয়া লোক অর্থ উপার্জনের জন্য যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকত তাদের বলা হতো তীক্ষ্ণ।

রসদ— রসদ নামধারী চরেরা ছিল নিষ্ঠুর, ধূর্ত, নীতিজ্ঞানহীন। প্রয়োজনে কাউকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে এরা দ্বিধা করত না।

পরিব্রাজিকা— সন্ন্যাসিনী, গণিকা, অভিনেত্রী, নর্তকী ও গায়িকা প্রভৃতি বৃত্তিতে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত মহিলাদের বলা হত পরিব্রাজিকা।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় সাধারণত দরিদ্র ও পতিত নরনারীরাই গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত হতো। কিন্তু গুপ্তচররা ছিল বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, সতর্ক, সত্যবাদী। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এরা কাজ করত। প্রতিপক্ষের শত প্রলোভন সত্ত্বেও নিজ প্রভুর প্রতি এরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত থাকত। গুপ্তচরবৃত্তিতে প্রশিক্ষণের সময় চরদের বিভিন্ন ভাষা এবং সাংকেতিক ভাষা ও নানারকম কলাবিদ্যায় নিপুণ করে তোলা হতো। অনেক সময় গোপন বার্তা সাংকেতিক ভাষায় পাঠানো হতো। রাজ্যে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগতির জন্য রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন।[২২] গুপ্তচররা সাধারণত মাংসবিক্রেতা, খানসামা, নাপিত, কৃষিজীবী, প্রসাধনকারী, কবি, গায়ক, চারণকবি, নৃত্যশিল্পী এবং বোবাকালার ছদ্মবেশে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করত।[২৩]

মুদ্রারাক্ষস থেকে জানা যায় মগধের রাজা নন্দ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর কাছে পরাজিত হয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চাণক্যের খবর সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। রাক্ষস সাপুড়ের ছদ্মবেশধারী এক চর চাণক্যের কাছে প্রেরণ করেছিলেন।[২৪] সে সাংকেতিক ভাষায় নন্দ রাজার মন্ত্রী রাক্ষসকে বার্তা পাঠিয়েছিল। চাণক্য ইন্দুশর্মাকে রাক্ষসের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারী ইন্দুশর্মা রাক্ষসের সবকিছু জেনে নেন। এদিকে রাক্ষস সিদ্ধার্থক নামক চণ্ডালের বেশধারী চরকে চাণক্যের কার্যকলাপ লক্ষ করার জন্য পাঠান। চাণক্যের প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও পারদর্শিতা দেখে সেই চর মন্তব্য করে : 'Amatya Rakshasenapati anavagapitapuryam Arya Chanakya charitam'— অর্থাৎ 'Rakshasa has not the prudence to understand Chanakya.'[২৫]

কালক্রমে চরের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় কারণ শাসনব্যবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। শুক্রনীতিতে রাজকর্মচারীদের সংখ্যা এবং গুপ্তচরের স্থান সম্পর্কে দুটি মত ব্যক্ত করা হয়েছে। রাজার পারিষদবর্গের দুটি তালিকায় তিনি চরদের স্থান সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রথম তালিকায় রাজার পারিষদদের মধ্যে প্রধান দশজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে— যথা,

পুরোহিত, অঞ্চলপ্রধান, মন্ত্রী, সেনাপতি, সুমন্ত্রক, সচিব, বিচারক, পণ্ডিত, অমাত্য এবং গুপ্তচর।[২৬] দ্বিতীয় তালিকায় রাজার প্রধান পারিষদের সংখ্যা আট— যথা সুমন্ত্রক, পণ্ডিত, মন্ত্রী, প্রধান সচিব, অমাত্য, বিচারক এবং রাজ প্রতিনিধি (viceroy)।[২৭] এখানে গুপ্তচরকে অষ্টপ্রধানের অনুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ আটজন রাজকর্মচারীর নির্দেশে গুপ্তচরের কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হতো।

গুপ্তচরদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হতো। এরা যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল। মাঘ রচিত *শিশুপালবধ* গ্রন্থে রাজনীতির সারকথা বলা হয়েছে : গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া রাজনীতি ব্যর্থ বলেই গণ্য হয়। (Politics without espionage is a failure.)[২৮] এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। ভারতের রাজনীতিতেও গুপ্তচরের প্রাধান্য সর্বদাই স্বীকৃত হয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণির গুপ্তচর বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত হতো। বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান এবং বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী গুপ্তচরদের রাজা প্রধান অমাত্য, রাজপুরোহিত, মহাসেনানায়ক, যুবরাজ, প্রাসাদের প্রধান দৌবারিক, প্রাসাদ অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ক, কারারক্ষী, সমাহর্তা, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান রাজকর্মচারী, পুলিশপ্রধান, পৌরপ্রধান, খনি এবং কারখানার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, মন্ত্রীপরিষদের প্রধান অধ্যক্ষ, সেনাপ্রধান, দুর্গ ও সীমান্তরক্ষী, অরণ্যপ্রধান (Forest officers) প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করতেন।[২৯] অনেক সময় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করতেন। কৌটিল্য এদের শনাক্ত করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দেন। অনেক সময় কৃপণ ধনী ব্যক্তি নিজ গৃহ অথবা কোনো বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে প্রচুর অর্থসম্পদ গচ্ছিত রাখত। কখনো কখনো অর্থশালী কৃপণ ব্যক্তি দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশের শত্রুর সাথে অর্থ আদানপ্রদানের ব্যাপারে লিপ্ত হতো। এ ধরনের ষড়যন্ত্রের আভাস পেলে গুপ্তচর রাজাকে জানাত। ষড়যন্ত্রকারীকে রাজা হত্যার নির্দেশ দিতেন।[৩০] গোপন খবর যথাস্থানে প্রেরণের জন্য গুপ্তচর সাংকেতিক ভাষা ও চিহ্ন ব্যবহার করত। কৌটিল্য 'সংস্থাভুক্ত' ও 'সঞ্চার' নামক চরদের এমনভাবে নিযুক্ত করতে বলেছেন যাতে তারা একে অপরের নিকট অপরিচিত থাকে। বিভিন্ন চরবাহিত সংবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হতো। চরদের প্রতিবেদনে ক্রমাগত অসংগতি থাকলে তাদের শাস্তি ছিল কঠোর।[৩১] *অগ্নিপুরাণে** চরদের বিবৃতি যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য 'উভয়বেতনচার' নামে একশ্রেণির গুপ্তচরের উল্লেখ করেন। বিজিগীষু রাজা (conquering king) এবং শত্রুপক্ষে একই ব্যক্তি উভয়ের চর নিযুক্ত থেকে দুপক্ষ থেকেই পারিশ্রমিক লাভ করত।[৩৩] তবে এ ধরনের চর যে কোনো মুহূর্তে রাষ্ট্রের বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারত। বিজিগীষু রাজার বন্ধু হিসেবে একজন চর তার শত্রুর গোপন খবর সংগ্রহ করে শত্রুর ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করতে পারত। আবার

---

* '.... the king should not trust the statement of a single spy unless corroborated by information received on the subject from different sources.'[৩২]

শত্রুর বন্ধুরূপে নিজের দেশের সর্বনাশ ডেকে আনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে ভারতীয় এবং গ্রিকদের বিবরণে ভারতীয় গুপ্তচরদের সততা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।[১০৪] তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যিই কি গুপ্তচররা সবসময় সততার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করত ? ভারত ইতিহাসে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ও বৈদেশিক আক্রমণে গুপ্তচরদের কি কোনো ভূমিকা ছিল না ? অত্যন্ত বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী কৌটিল্য কি এসব কারণেই রাজাকে বিভিন্ন চর পরিবেশিত সংবাদ সম্যকভাবে যাচাই করে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন ?

জনমত সংগ্রহে নিযুক্ত 'সত্রী' নামক গুপ্তচররা দুইদলে বিভক্ত হয়ে জনবহুল পান্থশালা, তীর্থস্থান, পানশালা ইত্যাদি স্থানে মিথ্যা কলহে লিপ্ত হয়ে একদল রাজার প্রশংসায় এবং অপর দল রাজার নিন্দার মুখর হয়ে উঠত। এভাবে তারা জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করত। চর মুণ্ডা অথবা 'জটিল' (জটাধারী সন্ন্যাসী) শ্রেণির মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য নিযুক্ত হতো। রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত একশ্রেণির মানুষ, রাজপরিবারের সদস্য ও মিত্র এবং বিশেষ বিশেষ স্থানের বিক্ষুব্ধ প্রজাদের মনোভাব মুণ্ডারা রাজাকে জানাত। অনেক সময় রাজার আত্মীয় ও পরিজন এবং মিত্রদের বিরোধিতা মীমাংসায় 'মুণ্ডা' বা 'জটিল' নামক গুপ্তচররা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত। অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারীদের সন্তোষবিধানের জন্য রাজা অনেকসময় তাদের মূল্যবান উপহার দিতেন। তা সত্ত্বেও এরা যদি প্রতিবেশী শত্রু, উপজাতি সর্দার (tribal chief) এবং নির্বাসিত রাজপুত্রের সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো— তবে রাজা এদের কর সংগ্রহ, ফৌজদারি বিচারের কাজে নিযুক্ত করতেন। এসব কাজে স্বভাবতই ঐ সব কর্মচারীদের ওপর জনতার আক্রোশ সৃষ্টি হতো। তখন রাজা এদের গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করতেন।[১০৫] অথবা শত্রুর সাথে মেলামেশা বন্ধ করার জন্য রাজা অনেকসময় ওইসব কর্মচারীর স্ত্রী ও সন্তানদের রাষ্ট্রের আওতায় রেখে তাদের দূরবর্তী খনিতে কাজ করার জন্য পাঠাতেন। কার্তিনীতিক (spies disguised as astrologers), নৈমিত্তিক (foretellers making predictions of omens) মোহুর্তিক (who could read the past, present and future) ইত্যাদি ছদ্মবেশী গুপ্তচর বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং শত্রুর সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা রাজাকে জানাত। অভ্যন্তরীণ ও বাইরের খবর সংগ্রহের জন্য রাজার যেমন গুপ্তচর ছিল সেরূপ রাজ্যের বনসম্পদ চোরডাকাত শিকারির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত ছিল অরণ্যাধ্যক্ষ। দস্যুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলে বনরক্ষীরা শঙ্খধ্বনি করে, দামামা বাজিয়ে বা পায়রার মাধ্যমে বিপদসংকেত পাঠাত। কখনো কখনো জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে তারা চোরডাকাত তাড়াত।[১০৬]

প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সকল শ্রেণির কর্মচারীদের গুপ্তচর ছিল। রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন সমাহর্তা (collector general)। এছাড়া ছিলেন প্রদেষ্টা (commissioners), গোপ (village accountant) এবং স্থানিক। এরা সকলেই গুপ্তচর নিযুক্ত

করতেন। গুরুত্ব অনুযায়ী সমাহর্তা জনপদকে জেলা ও গ্রামে ভাগ করতেন। জনপদ চারটি জেলা এবং কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত করা হতো। প্রত্যেক জেলা আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হতো। সমাহর্তা করমুক্ত গ্রামগুলির সংখ্যা নিরূপণ করতেন। করমুক্ত গ্রাম যথাক্রমে তিনশ্রেণির ছিল— যথা সৈন্য সরবরাহকারী গ্রাম, পশু সরবরাহকারী গ্রাম (যে সব গ্রাম শস্য, গবাদি পশু, সোনা এবং কাঁচামাল যোগান দিত) শ্রমদানকারী গ্রাম (বিনা পারিশ্রমিকে করের বিনিময়ে শ্রম দিত এরূপ গ্রাম)[৩৭] শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম। গ্রাম প্রধানত দশ, কুড়ি, একশ এবং এক হাজার ইউনিটে ভাগ করা হতো। প্রত্যেক গ্রামের প্রধান ছিল গ্রামিক। গ্রামের হিসেব রাখার জন্য সমাহর্তা 'গোপ' নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেক গ্রামের খবর গ্রামিক উর্ধ্বতন কর্মচারীকে জানাত। গ্রামের অপরাধসংক্রান্ত ঘটনাবলি গ্রামিক দশটি গ্রামের প্রধান, দশটি গ্রামের প্রধান কুড়িটি গ্রামের প্রধান, কুড়িটি গ্রামের প্রধান একশ গ্রামের প্রধান এবং একশো গ্রামের প্রধান এক সহস্র গ্রামের প্রধানকে জানাত।[৩৮]

গোপ গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করে চাষের জমি, পতিত জমি, বাসস্থানের জমি, সবজি ও ফলের বাগান, পশুচারণ ক্ষেত্র, অরণ্য, মন্দির, শ্মশান, সত্র (হোটেল) রাস্তা এবং ঘরবাড়ির পরিসংখ্যান নিত। গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ— কৃষক, পশুপালক, ব্যবসায়ী, কারিগর, শ্রমিক ও দাসদাসী এবং পশুর সংখ্যা গণনা করে একটি তালিকা তৈরি করত। গুপ্তচর মারফত গ্রামের গোপ বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের চরিত্র, আচরণ, পেশা, আয়ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত সমস্ত খবর সংগ্রহ করত। জরিমানা হিসেবে গৃহীত সোনা, অর্থ এবং করের পরিমাণ সম্পর্কে সমস্ত খবর গোপকে রাখতে হতো। প্রদেষ্টা (commissioners) গোপ এবং স্থানিকদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করত।[৩৯]

সমাহর্তা নিযুক্ত গুপ্তচর গৃহপতিক ও বৈদেহক জেলা ও গ্রামের শাসনকর্তা প্রদত্ত রিপোর্ট সঠিকভাবে যাচাই করে সমাহর্তার নিকট পেশ করত। এ ছাড়া গৃহপতিক ও বৈদেহক গ্রামে অপরিচিত আগন্তুক ও গ্রাম ছেড়ে যাওয়া লোকের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। সমাহর্তা বণিকের বেশধারী গুপ্তচরদের মাধ্যমে জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, বন, খনি ইত্যাদির সংখ্যা, জলাশয়ের সংখ্যা, জল ও স্থলপথে আমদানি করা বাণিজ্যসম্ভার, জিনিসপত্রের দাম, টোল, পথকর ও যানবাহনের ওপর নির্ধারিত কর থেকে গৃহীত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি সব খবর সংগ্রহ করতেন। যে সব বণিকের ভরণপোষণ ও জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা করা হতো তাদের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকা আদায় করা হতো।[৪০] সমাহর্তার অধীনে তস্করবেশী চর উপাসনাস্থল, রাস্তার সংযোগস্থল, নির্জন ও পরিত্যক্ত স্থান, পুষ্করিণীর কাছাকাছি জায়গা, নদী ও কূপ, তীর্থস্থান, সাধুর আশ্রম, গহন অরণ্য এবং পাহাড়পর্বতে দাগি আসামি বা শত্রুর চরদের অনুসন্ধান করত। সাধুবেশী চর রাখাল, বণিক এবং সরকারি কর্মচারীদের খবর সমাহর্তাকে জানাত।

জেলার শাসনকর্তার মতো রাজধানীর শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল নাগরিকের

ওপর। তাকে শাসনকার্যে সহায়তা করত স্থানিক ও গোপ নামক গুপ্তচর। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অনুসন্ধানে স্থানিক ও গোপ পরিত্যক্ত গৃহ, পানশালা, জুয়ার আড্ডা, সাধুর আখড়া, রান্না করা মাংস বিক্রেতার দোকান এবং পান্থশালায় যেত। জেলা, রাজধানী এবং অন্যান্য শহরের শাসকরা শুধুমাত্র গুপ্তচরদের প্রতিবেদনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজেরাও পরিক্রমায় বেরোতেন। তারা সাধারণত জলাধার, রাস্তা, নগর থেকে বাইরে যাবার গোপন রাস্তা, দুর্গ এবং দুর্গের প্রাচীর ইত্যাদি অঞ্চল পরিভ্রমণ করতেন। রাষ্ট্রের সুশাসন, নিরাপত্তা ও প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রশাসনের সমস্ত কর্মী এবং বিশ্বস্ত গুপ্তচর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করত। *মার্কণ্ডেয়পুরাণে* রানি মদালসা পুত্র অলর্ককে রাজকর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেন যে, প্রজা, শত্রু, মিত্র, রাজকর্মচারী এবং দেশের সর্বত্র গোপন খবর সংগ্রহের জন্য রাজার গুপ্তচর নিয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয়। বায়ুর মতো নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে গুপ্তচররা গোপন খবর সংগ্রহ করে রাজাকে জানাবে।[৪১]

রাষ্ট্রের মঙ্গল এবং ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বত্রই গুপ্তচরদের উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপের এতটা প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি শক্তিশালী গুপ্তচরদের সহায়তায় যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মঙ্গল হতে পারে না। কিন্তু ভারত ইতিহাসের যে সময়কাল আমাদের আলোচনার বিষয় সেই সময় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী শাসক অত্যাচারী হয়ে ওঠেননি। প্রজানিপীড়নের* তেমন ঘটনাও শোনা যায় না। শাসনব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য ভারতীয় রাজারা** গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন।

বিশ্বস্ত, অনুগত এবং বিভিন্ন ভাষা, গূঢ়লেখ (code language) ও কলাবিদ্যায় নিপুণ গুপ্তচররা ছদ্মবেশে রাজার অষ্টাদশ মহামাত্য যথা অমাত্যপ্রধান (Prime Minister), রাজপুরোহিত, মহাসেনানায়ক, যুবরাজ, দৌবারিক (the chief door keeper of the palace), অন্তরবানিশিক (superintendent of the harem), প্রশস্ত (the jailor), সমাহর্তা (collector general), সন্নিধাতা (treasurer), প্রদেষ্টা (the commissioner), নায়ক (the city police), পৌর (the chief supervisor of the city), ব্যবহারিক (the superintendent of transactions and factories) মন্ত্রী পারিষদাধ্যক্ষ (the head of the council of ministers), দণ্ডপাল (the head of the army) দুর্গ, রাজ্যের সীমান্ত এবং

---

* 'Among the Aryan people there has never arisen that despotism which blots out man as in Egypt, Babylon, China and among the Mussalmans and Yartar tribes or if it has appeared it has not been of long duration.'[৪২]

** 'A king when he observes through his spies the acts of all persons and thus recognizes what conduces to the general good of the total number, he is said to assume the form of Aditya. General good for everyone was the political maxim of ancient India.'[৪৩]

অরণ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারীদের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতেন।[৪৪] মনু দুর্নীতিপরায়ণ রাজকর্মচারী, অসাধু চিকিৎসক, চতুর গণিকা, উৎকোচ গ্রহণকারী কর্মচারী, জাল মুদ্রা ও জাল সোনা ব্যবসায়ীদের শনাক্ত করার জন্য সমাজবিরোধীর ছদ্মবেশধারী গুপ্তচর নিয়োগের পরামর্শ দেন। সংশোধিত চোর, ডাকাতকে মনু ঐ ধরনের অপরাধী শনাক্ত করার জন্য নিযুক্ত করতে বলেন।[৪৫] মধ্যযুগের সুদক্ষ ও উদার শাসনকর্তা শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য সংশোধিত অপরাধী নিযুক্ত করতেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে দেশিবিদেশি ঐতিহাসিকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক Keene বলেন, 'No ruler not even the British has shown so much wisdom as this Pathan.' *অগ্নিপুরাণে* অসৎ রাজকর্মচারীকে রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[৪৬] *যশশতিলক* (Yasastilaka) গ্রন্থে রাজাকে রাজকর্মচারী ও মন্ত্রীদের ওপর অতিরিক্ত আস্থা রাখার বিরোধিতা করা হয়েছে। একবার এক রাজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমাত্যর বিরুদ্ধে গুপ্তচর খবর দেয় যে ঐ অমাত্যর মধ্যে আভিজাত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সাহস এবং বিচক্ষণতার অত্যন্ত অভাব। গুপ্তচর* রাজাকে সাবধান করে বলে যে ঐ মন্ত্রীর ঔদ্ধত্য ও কুশাসন যে-কোনো সময় রাজার বিপদ ডেকে আনতে পারে। শুধু তাই নয় তার দুর্ব্যবহারে রাজার আত্মীয়স্বজন, প্রজা, মিত্র এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যে কোনো সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। রাজা সিংহাসনচ্যুত হতে পারেন, এমনকি তার প্রাণ সংশয়েরও যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

চোর, ডাকাত, খাদ্যে ভেজাল-কারবারি এবং অন্যান্য অপরাধীদের চিহ্নিত করত গুপ্তচর। কৌটিল্য (কণ্ঠকশোধন BK IV) তেরো রকমের অপরাধী চিহ্নিত করেন। যথা, গূঢ়জীবী (dishonest people), উৎকোচ গ্রহণকারী রাজকর্মচারী, জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারক, নকল সোনা ব্যবসায়ী, রসদ (poisoners), নারী পাচারকারী ইত্যাদি। চোরবেশী গুপ্তচর এদের শনাক্ত করত।[৪৮] এরা সমাজবিরোধীদের অপরাধমূলক কাজ করার প্ররোচনা দিত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য কেনাবেচা বা গচ্ছিত রাখার সময় সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো।[৪৯] মনু অপরাধীদের শাস্তির জন্য কৌটিল্য প্রবর্তিত কৌশল প্রয়োগ করতে বলেন।[৫০] অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য কৌটিল্য, মনু এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ যে কৌশল প্রয়োগের কথা বলেছেন তা অভিনব এবং বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য।

প্রাচীনকাল থেকে পদচিহ্ন অনুসরণ করে অপরাধী খুঁজে বের করা হতো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরাজিত দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে পলায়ন করেন। যুধিষ্ঠির পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ চর প্রেরণ করে দুর্যোধনকে খুঁজে পান।[৫১] *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে জানা যায় রাজা সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের

---

* It shows how wise, truthful, honest and loyal the spies were expected to be. They were to be courageous enough to speak the truth even against the most influential but dishonest officials of the king."[৪৭]

ঘোড়া চুরি হয়ে যায়। প্রহরায় নিযুক্ত রাজপুত্ররা ঘোড়ার খুরের ছাপ লক্ষ করে পাতালে প্রবেশ করে ও ঘোড়া উদ্ধার করে।[৫২]

পদচিহ্ন অনুসরণ করে অপরাধী আবিষ্কারের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনি *বিষ্ণুপুরাণের* হরিবংশে আছে। যাদবপ্রধান বাসুদেব কৃষ্ণ ঐ বংশের অপর শাখার (Satvata clan) অধিপতি সত্রাজিতের এক অতি মূল্যবান রত্ন (স্যমন্তক) দেখে মুগ্ধ হন। ঐ রত্নখচিত একটি হার সত্রাজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনের গলায় ছিল। একদিন শিকারে গিয়ে প্রসেন নিরুদ্দিষ্ট হন। তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সত্রাজিৎ এবং তার অনুচরবর্গ সন্দেহ করতে লাগল রত্নের লোভে কৃষ্ণ প্রসেনকে হত্যা করেছেন। এই কথা শুনে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে-অরণ্যে প্রসেন শিকারে গিয়েছিল সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রসেনের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে কৃষ্ণ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, সেখানে প্রসেন ও একটি সিংহের মৃতদেহ পরে আছে। কিন্তু রত্ন বা হারের কোনো চিহ্ন নেই। সুচতুর কৃষ্ণ পায়ের ছাপ অনুসরণ করে অরণ্যের অপর প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিল আদিবাসী প্রধান জাম্বাবতের গৃহ। দূর থেকে কৃষ্ণ লক্ষ করলেন জাম্বাবতের শিশুপুত্র রত্নটি নিয়ে খেলা করছে। কৃষ্ণ রত্নটি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই শিশুটির পরিচারিকা চিৎকার করে উঠল। জাম্বাবতও সেখানে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণকে আক্রমণ করার সাথে সাথে দুজনের মধ্যে শুরু হল যুদ্ধ। পরাজিত জাম্বাবত তখন বাধ্য হয়ে কৃষ্ণকে রত্নটি ফিরিয়ে দিল। সত্রাজিতের হাতে রত্নটি ফিরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ তাকে সব কথা বলেন। কৃষ্ণের সততা ও অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সত্রাজিৎ নিজ কন্যা সত্যভামার সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের আয়োজন করেন।[৫৩]

প্রাচীন ভারতে পদচিহ্ন* দেখে অপরাধী শনাক্তকরণে অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত করা হতো। গবাদিপশু বা সম্পত্তি চুরি গেলে গুপ্তচর দুষ্কৃতির পদচিহ্ন অনুসরণ করে আসামিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। গুপ্তচর ছাড়া পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে দুষ্কৃতী অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হত 'সূচক'।[৫৫] পরবর্তীকালে রাজা দুষ্কৃতী অনুসন্ধানের জন্য 'সূচক' নিযুক্ত করতেন।[৫৬] 'স্তোভক' নামক একশ্রেণির চর অপরাধী চিহ্নিত করার জন্য রাজার দ্বারা নিযুক্ত হতো। এরা অর্থের বিনিময়ে কাজ করত। শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর শাখার সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল না।[৫৭] পরবর্তীকালে সম্ভবত 'সূচক' পদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পুলিশ ও গুপ্তচর একে অপরের সহযোগিতায় কারাগারের বন্দীদের ওপর নজর রাখত। পুলিশদের প্রধান কাজ ছিল অপরাধী শনাক্ত করে তাকে বিচারকের কাছে

---

* 'When the footmarks are lost, cannot be traced any further, the neighbours, inspectors of the roads and governors of the region shall be made responsible for the loss."[৫৪]

শান্তিদানের জন্য উপস্থিত করা। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও দুষ্কৃতী শনাক্ত করাই ছিল পুলিশের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু গুপ্তচরের ক্ষেত্রে বিপদের ঝুঁকি ও দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। শাসনব্যবস্থার সর্বত্র গুপ্তচরদের কার্যকলাপ বিস্তৃত ছিল। সে কারণে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও সতর্কমূলক মনোভাব ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে যুগেও পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি ছিল। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ পুলিশের সংসর্গ এড়িয়ে চলত। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর অত্যাচারে অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ পুলিশকে সহায়তা করতে সংশয় বোধ করত। এসব কারণে পূর্ব ভারতের রাজন্যবর্গ পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভূমি অথবা গ্রামদানের সময় ঐ অঞ্চলে পুলিশ ও সৈন্যদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৫৮] ব্যক্তিগত লাভের জন্য উচ্চপদস্থ থেকে নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু গুপ্তচর দুর্নীতিপরায়ণ হলে শুধু রাজার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতো তাই নয়, সমগ্র রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হতো।

কৌটিল্য শত্রুর ধ্বংসসাধনের জন্য গুপ্তচর মারফত ঐ অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সপক্ষে আনার পরামর্শ দেন। তিনি চারশ্রেণির বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির উল্লেখ করেন। যথা, ক্রুদ্ধবর্গ (যে সব ব্যক্তি রাজার কুনজরে পরে অকারণে বঞ্চনা ও অপমান এবং ক্ষতির শিকার হতো), ভীতবর্গ (যে সব ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজের জন্য প্রকাশ্যে শাস্তি পেত বা অপমানিত হতো অথবা অসদুপায়ে ধন সঞ্চয় করত), লুব্ধবর্গ (করভারে জর্জরিত হয়ে দারিদ্র্যের সম্মুখীন ব্যক্তি অথবা কৃপণ, নারী ও সুরায় আসক্ত, এবং অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয়কারী ব্যক্তি), মানীবর্গ (উচ্চাভিলাষী, অহংকারী, উদ্ধত এবং হিংসাপরায়ণ)। কৌটিল্য এসব ব্যক্তিকে সাম, দান দ্বারা বশীভূত করার উপদেশ দেন। ভেদনীতি দ্বারা নিজ রাজ্যের প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে সপক্ষে আনার নীতিও প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।[৫৯] কৌটিল্যের মতো মনুও শত্রুপক্ষের বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সপক্ষে আনার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতে বলেন।[৬০] *অগ্নিপুরাণ* থেকে জানা যায় ছদ্মবেশী চর শত্রুর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গকে সপক্ষে আনার জন্য শত্রুরাজ্যের সর্বত্র নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াত।[৬১] শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তার কথা রূপক গ্রন্থ *কথাসরিৎসাগর*[৬২] এবং *হিতোপদেশ উপকথা* গল্পে[৬৩] বারবার আলোচনা করা হয়েছে।

শাসন বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগকারী সংস্থা ছিল গুপ্তচর। এই কাজ ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন গোপনীয়। সতর্কতা রক্ষার জন্য গোপন বার্তা সংজ্ঞালিপি বা গূঢ় লেখার মাধ্যমে আদানপ্রদান করা হতো।[৬৪] সুপ্রাচীন কাল থেকে গোপনবার্তা বহনকারী একশ্রেণির কর্মচারী (couriers) নিয়োগ করা হতো।[৬৫] ঠিক এই পদ্ধতিতে আরবে রানার বা ঘোড়া ও উটের পিঠে বার্তাবাহক গুপ্তসংবাদ আদানপ্রদান করত। দূরবর্তী স্থানে খবর পাঠানোর জন্য পায়রা ব্যবহার করা হতো।[৬৬] খ্রি.পূ. ৭০০-১৮০ অব্দের মধ্যে ভারতে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। দূত ও শাসনার্হ রাজকীয় দলিল বা পরোয়ানা এবং অন্যান্য বার্তা বহন করত।[৬৭] মগধে মৌর্য শাসনকালে বিভিন্ন

প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকার 'লেখক' (Minister of correspondence)-এর অধীনে একটি বিভাগ* স্থাপন করে।

বিভিন্ন উপাদান ও সূত্র থেকে জানা যায় দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য গুপ্তচরদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। কিন্তু মিথ্যা খবর সরবরাহকারী গুপ্তচরের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। শত্রু রাজ্যে বিশেষ করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শত্রুর হাতে ধৃত গুপ্তচরের শাস্তি ছিল কঠোর। এমনকি তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে মানবিকতার প্রশ্ন উঠত না। বিচারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ *মুদ্রারাক্ষস* নাটক থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষস অভয় দত্ত নামক গুপ্তচরকে বিষাক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। চিকিৎসক বেশধারী অভয় দত্তকে দেখে চাণক্যের সন্দেহ হয়। একটি স্বর্ণপাত্রে বিষাক্ত ওষুধ ঢেলে দিতেই পাত্রটি বিবর্ণ হয়ে ওঠে। চাণক্য ঐ বিষ অভয় দত্তকে পান করার আদেশ দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অভয় দত্তের মৃত্যু হয়।[৬৯] *মুদ্রারাক্ষসে* আর একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাক্ষস আর একবার চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার জন্য তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশের পথে একটি সুড়ঙ্গপথ খনন করেন। রাক্ষসের চর বীভৎসক কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ঐ সুড়ঙ্গে অলক্ষ্যে লুকিয়ে ছিল। চন্দ্রগুপ্ত শয্যাগৃহে প্রবেশের আগে চাণক্য প্রতিরাতের মতো ঘর পরীক্ষা করার জন্য সেখানে উপস্থিত হতেন। তার সতর্ক দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দেয়ালের একটি ছোটো গর্তের ওপর। সেখান থেকে খাদ্যকণা মুখে সারি সারি পিঁপড়ে ঢুকতে দেখে চাণক্যর সন্দেহ হল নিশ্চয়ই গুপ্তঘাতক খুব কাছাকাছি জায়গায় আহার গ্রহণ করছে। অনুসন্ধান করে চাণক্য জানতে পারলেন তার সন্দেহ অমূলক নয়। তৎক্ষণাৎ ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। বীভৎসক সহচরেরা আগুনে পুড়ে মরল।[৭০]

রাজনীতি অত্যন্ত জটিল বিষয়। ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতি থেকে রাজনীতি কখনো সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। গুপ্তচরদের মধ্যে দুর্নীতি একেবারেই ছিল না একথা বলা যায় না। প্রলোভনের শিকার হয়ে এরা অনেক সময় নীতিবিরুদ্ধ কাজ করত। কৌটিল্য, শুক্রাচার্য তাই বলেছেন, তিনজন গুপ্তচরের আনীত সংবাদে সামঞ্জস্য থাকলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য। অসংলগ্ন ও মিথ্যাসংবাদ সরবরাহকারী চরের কঠোর শাস্তি প্রাপ্য। *মণিমেখলাই লিপি*[৭১] এবং *রাজতরঙ্গিণীতে*[৭২] গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা আছে। গুপ্তচরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় রাজাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যেতে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় প্রাচীন ভারতে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত গুপ্তচররা ছিল সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ। গুপ্তচরের সহায়তায় রাজা অনেকসময় রাজকর্মচারীদের রোষ এবং ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গুপ্তচরদের

---

* 'News writing was linked with espionage. Hence transmission of news presupposed the postal department.'[৬৮]

কর্মতৎপরতা ও সাহস বিজিগীষু রাজাকে জয়মাল্য এনে দিত। কিন্তু এসব গুপ্তচরের নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। গুপ্তচররা তাদের যোগ্যতা ও নিষ্ঠার উপযুক্ত মূল্য বা প্রতিদান সবসময় পেত না। প্রাচীন রাজনীতিবিদগণ গুপ্তচরদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দেবার পরামর্শ দিলেও তা কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর-বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হলেও নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাবে এর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে রচনা করা সম্ভব নয়। একমাত্র মৌর্যযুগে গুপ্তচরদের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজবংশের রাজত্বকালে প্রসঙ্গক্রমে গুপ্তচরের উল্লেখ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের উপযোগিতা কখনো হারিয়ে যায়নি।

মৌর্যযুগ

মৌর্যযুগকে গুপ্তচর-ব্যবস্থার সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মগধে নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটি বৃহৎ শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। বিজেতা ও শাসক হিসেবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। শাসনব্যবস্থার সর্বত্র তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে চৌকিদার নিযুক্ত করা হতো। সম্রাট নিজে আয়ব্যয়ের নিয়মিত হিসাবে রাখতেন, মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন, পুরোহিত ও তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতো। গুপ্তচরদের কাছ থেকে সম্রাট নিয়মিতভাবে রাজ্যের ও বিভিন্ন শাসনবিভাগের খবরাখবর সংগ্রহ এবং বিদেশি দূতদের আপ্যায়ন করতেন।[৭৩] তিনি রাজকর্মচারীদের শাসন পরিচালনার নির্দেশিকা তৈরি করতেন ও দূরবর্তী অঞ্চলের শাসকশ্রেণির ওপরও গুপ্তচর মারফত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন।[৭৪] অ্যারিয়ান ও স্ট্রাবো চন্দ্রগুপ্তের আমলে উপদর্শক (overseers) এবং পরিদর্শক (inspectors) নামক কর্মচারী*দের কথা বলেন। 'জুনাগড় লিপি'তে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় এবং প্রদেষ্ট্রী অথবা অর্থশাস্ত্রের গূঢ়পুরুষ অ্যারিয়ান, স্ট্রাবো বর্ণিত উপদর্শক এবং পরিদর্শকের মতো একই ধরনের কাজ করত। বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ ব্যক্তিরা এই শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হতো। শাসনব্যবস্থার সমস্ত খবর সংগ্রহ করে এরা সম্রাটকে জানাত। স্ট্রাবো উল্লেখ করেন পরিদর্শককে সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত ছিল

---

* J. W. Mccrindle এর লেখা Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (85.48) থেকে জানা যায়, 'the superintendents carried on their duties with the assistance of scribes, accountants, coin-examiners, stock-takers and additional secret overseers.'

নটী এবং যৌনকর্মী। এদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমস্ত খবরই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে যেত।

মৌর্যযুগে গুপ্তচর এতই সুদক্ষ ছিল যে তারা জনসংখ্যা এমনকি গৃহপালিত পশুর সংখ্যারও হিসেব রাখত। নগর-আধিকারিক (magistrates) বহিরাগত ব্যক্তিদের বিবরণ নথিভুক্ত করে তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি রাখতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা মৌর্যযুগে স্বায়ত্তশাসিত নগরের উল্লেখ পাই। নগরের শাসনব্যবস্থা তিরিশ সদস্যযুক্ত এক কাউন্সিল* পরিচালনা করত। ছয়টি বিভাগে বিভক্ত এই কাউন্সিলের প্রতি বিভাগের সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচ। শস্য, পশম, ইক্ষু এবং অন্যান্য দ্রব্যের গুণগত মান যাচাই করে সরকার থেকে দাম নির্ধারণ করা হতো। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাজার বণিকবেশী চর সৈন্যদের কাছে দ্বিগুণ দামে জিনিস বিক্রি করে আদায়ীকৃত অর্থ রাজকোষে জমা করত। বণিকবেশী রাজার চরেরা কৌশলে বণিকদের কাছ থেকে সোনা, রূপা এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহ করত। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় গুপ্তচর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধানকে বলা হতো 'মহামাত্রপসর্প'। গুপ্তচরদের কাজে যেমন গুরুত্ব ছিল তেমনই ছিল বিপদের ঝুঁকি। তাই প্রশাসনের কর্মচারী এবং অমাত্যদের মধ্যে যারা সততা ও দৃঢ়তার বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হতো তাদের গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত করা হতো।[৭৬]

অশোকের রাজত্বকালে গুপ্তচর বিভাগের গঠন বা কর্মপদ্ধতির তেমন কোনো রূপান্তর ঘটেনি। গুপ্তচরদের সঙ্গে অশোক চন্দ্রগুপ্তের মতোই সাক্ষাতের একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করেন। অশোক ঘোষণা করেন, যে কোনো সময় এবং যে কোনো স্থানে প্রতিবেদক ও পরিদর্শকগণ প্রয়োজনে সম্রাটকে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রেরণ করতে পারবেন।[৭৭] দূরবর্তী অঞ্চলের শাসকদের ওপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য একশ্রেণির ভ্রাম্যমান চর** নিযুক্ত হতো। কল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠনের উদ্দেশ্যে সম্রাটের দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। বিচারব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত মহামাত্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নগর পরিভ্রমণ করে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। জেলা শাসকগণ প্রতি তিন বছর অন্তর নগর পরিদর্শন করতেন। এরা প্রধানত নগরের শাসনব্যবস্থার তদারকিতে নিযুক্ত ছিলেন।[৭৯]

অশোকের সময় প্রদেশগুলি জেলায় বিভক্ত ছিল। 'প্রাদেশিক' 'রাজুক' ও 'যুক্ত' এরূপ বিভিন্ন কর্মচারীদের সহায়তায় জেলার শাসন পরিচালিত হতো। ঐতিহাসিক থমাসের মতে 'প্রদেশ' শব্দের অর্থ 'প্রতিবেদন'। তাঁর মতে অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত প্রদেষ্ট্রী

---

* 'The watch and ward staff and the police department of a big metropolitan city like Pataliputra maintained the details quite correctly about all affairs of the city.'[১৭৫]

** 'The frequency of inspection and the existence of spies must have carried with it the flavour of a totalitarian state....'[১৭৮]

এবং প্রাদেশিক একই ব্যক্তি। প্রদেষ্ট্রী নামক কর্মচারীরা কর-সংগ্রহ, দুর্বিনীত এবং উদ্ধত কর্মচারীদের শাস্তিপ্রদান, ফৌজদারি বিচার, চোরডাকাতের অনুসন্ধান এবং পরিদর্শক ও তার অধীনস্থ কর্মচারীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। তারা গোপ, সমাহর্তা, স্থানিক এবং অধ্যক্ষদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতেন। তবে প্রাদেশিক এবং প্রতিবেদক একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।[৮০]

অশোকের আমলে জনমত সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের 'পুলিশানি' আখ্যা দেওয়া হতো। এরা অনেকটা বর্তমান কালের public relation officers-দের মতো। ইয়োরোপীয় গবেষক Hultzsch এদের গূঢ়পুরুষ বলে শনাক্ত করেন। এরা সর্বোচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন— এই তিনশ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত পুলিশানি সম্রাটের শাসননীতি নির্ধারণে নিজস্ব মতামত দিতেন।[৮১] *নীতিবেদক* অর্থশাস্ত্রে (chapt.xvi) বর্ণিত চার (চর) নিঃসন্দেহে গুপ্তচর। *প্রতিবেদকের* ওপর সম্রাটের যথেষ্ট আস্থা ছিল। পুলিশানি এবং *প্রতিবেদক* কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করত।[৮২]

সমসাময়িক বিবরণ এবং অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি শাসনব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র, ধর্মযুত নামক কর্মচারী নিয়োগ করেন। এরা বৌদ্ধধর্মের বার্তা সিংহল এবং প্রতিবেশী রাজ্যে প্রচার করতেন। অশোকের আমলে গুপ্তচরদের কার্যকলাপের একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়। অশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশ দার্শনিক হয়ে ওঠেন। গুপ্তচর, পুলিশ ও সামরিক-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য বাড়তে থাকে। গুপ্তচর-ব্যবস্থায় শৈথিল্য শাসনব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সামরিক-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়, রাজকর্মচারীরাও ধীরে ধীরে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। অশোকের রাজত্বের অন্তিমকালে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সংকট অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে।

সুঙ্গ আমল

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। সেই সুযোগে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। গুপ্তচরব্যবস্থার অধঃপতন মৌর্যদের বিপর্যয়ের একটি কারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পুষ্যমিত্র পাটলিপুত্র ছাড়া অযোধ্যা, বিদিশা, জলন্ধর, শাকল (শিয়ালকোট) এবং দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারী বসুমিত্র সুদক্ষ শাসক ছিলেন। মৌর্য

পরবর্তী যুগের শাসনব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়। এ সময়ের গুপ্তচর ব্যবস্থার ইতিহাস জানা যায় না। তবে গুপ্তচর-প্রথা বিলুপ্ত হয়নি। সুঙ্গ বংশের শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি ছিলেন অযোগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল। তিনি অমাত্য বসুদেব দেবভূমিকে ধ্বংস করার জন্য গুপ্তচরদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। দেবভূতির দাসীর কন্যা রানির ছদ্মবেশে তাকে হত্যা করেন।[৮৩]

মগধকে কেন্দ্র করে মৌর্য ও সুঙ্গদের আমলে যে বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল পরবর্তী কাণ্বংশের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ৭৫-৩০ অব্দ) তা শুধুমাত্র মগধের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ে মগধের গুরুত্ব কমে যায়।

সাতবাহন ও চেট আমল

সুঙ্গ ও কাণ্বদের মধ্যে যখন বিরোধিতা চলছিল সেই সময় কলিঙ্গে চেটী এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সাতবাহন বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৮৪] ভিনসেন্ট স্মিথ এবং গোপালাচারী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে সাতবাহনরা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেন।[৮৫] এই বংশের শ্রেষ্ঠ দুজন রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী আর দ্বিতীয় পুলুমায়ী। ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে সাতবাহন শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো। ধর্মশাস্ত্রে গুপ্তচর শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচিত হতো। গুপ্তচর ছাড়া সাতবাহনরা এত সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারত না।

অশোকের মৃত্যুর পর খ্রি.পূ. প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গের ইতিহাস অস্পষ্ট। খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীতে চেটবংশীয় খারবেল মহারাজা উপাধি ধারণ করেন। তিনি কলিঙ্গ নগরের সংস্কার সাধন করে তা সুরক্ষিত করেন। পরে মগধ, অঙ্গ এবং দক্ষিণের মসলিপত্তমের অন্তর্ভুক্ত পিহুণ্ড এবং তামিলের পাণ্ডরাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁর গুপ্তচর-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না পাওয়া গেলেও বলা যেতে পারে বিজিগীষু অন্যান্য সম্রাটদের মতো তিনি রাজ্যের সুরক্ষা এবং পররাষ্ট্র অধিকারের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করেন।[৮৬]

মৌর্য-পরবর্তী যুগ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অন্তর্বর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রিক, সিদিয়, (শক) পার্সিয়ান (পল্লব) এবং কুষাণরা আধিপত্য বিস্তার করে। বিদেশি শাসনের এই দীর্ঘসময় 'সিদিয় যুগ' নামে অভিহিত। বিদেশি শাসকবর্গ দেশিবিদেশি পদ্ধতির সংমিশ্রণে সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে পারস্যের অনুকরণে satrapy (ক্ষত্রপ) নামক কর্মচারী নিযুক্ত করা হতো। গ্রিক উপাধিধারী মেরিডার্ক এবং স্ট্র্যাটেগোর পাশাপাশি অমাত্য ও মহাসেনাপতি শাসনকার্যে নিযুক্ত হতেন।[৮৭] সিদিয়রা অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী

মহামাত্র[৮৮], রাজুক[৮৯], সঞ্চারক বা সঞ্চারী[৯০] (গুপ্তচর) নামক কর্মচারীর সহায়তায় শাসনকার্য* পরিচালনা করত। বিভিন্ন সময়ে গুপ্তচরদের কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ না থাকলেও শাসনব্যবস্থায় এর গুরুত্ব স্বীকৃত ছিল।**

কুষাণ যুগ

পার্থিয়ান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষে কুষাণরা প্রবেশ করে। প্রাচীনকালে চীনে ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতির বাস ছিল। ইউ-চি জাতির একটি শাখা কুষাণ। কুষাণ রাজারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অগ্রগতি এবং প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্কের নাম সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক H. G. Rowlinson বলেন, 'The Kushan period is one of the utmost importance in the history of Indian culture....'। কুষাণ রাজারা দণ্ডনায়ক ও মহাদণ্ডনায়ক নামক একশ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। এরা প্রধানত সামরিক-বিভাগ, বিচার-বিভাগ ও পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল।[৯৩] পুলিশ দপ্তরের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল গুপ্তচর। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় দণ্ডনায়ক ও মহাদণ্ডনায়কদের অধীনে গুপ্তচর ছিল।

গ্রামশাসনে কুষাণরা এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসিত ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল গ্রামশাসক।[৯৪] গ্রামের শাসন তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত ছিল সচিব। নগর-পরিদর্শক (সর্বার্থচিন্তক) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামিকদের ওপর নজর রাখত। জেলার মানুষদের ওপর যাতে জেলাশাসক অত্যাচার না করে তা দেখার জন্য সর্বার্থচিন্তক গুপ্তচর পাঠাতেন।[৯৫]

কুষাণশক্তির পতন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতে

---

* ঐতিহাসিক R. C. Roy Choudhury বলেন, 'A less pleasing feature of ancient Indian polity in the scythian, as in other times, was the employment of spies, particularly of the samcharamtakas or wandering emissaries whose functions are described with gruesome details in the Arthasastra.'[৯৯]

** বাণভট্টের *হর্ষচরিত* থেকে গুপ্তচর প্রসঙ্গে বেশ কিছু কাহিনির বিবরণ পাওয়া যায়।

১. জনৈক যবন রাজা রাজসভায় একটি গোপন প্রতিবেদন পড়ছিলেন। রাজমুকুটের হীরকের মধ্যে গোপন খবরটি প্রতিফলিত হয়। রাজার পরিচারিকা সেটি দেখতে পায় এবং যবনরাজ গুপ্তচরের হাতে নিহত হন।

২. গণ্ডক অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে চামুণ্ডীরাজ পুস্কর সম্পা রাজ্যের গুপ্তচরদের হাতে প্রাণ হারান।

৩. মৈখরী রাজ ক্ষাত্রবর্মা বন্দিদের রাজবন্দনা গান শুনতে ভালোবাসতেন। মগ নামক শত্রুর চরেরা বন্দির ছদ্মবেশে ক্ষাত্রবর্মার স্তুতিগান করতে করতে তাকে হত্যা করে।

এসব ঘটনায় প্রমাণিত হয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষ করে সামরিক বিভাগে গুপ্তচররা বিভিন্ন কৌশলে শত্রু নিধনে প্রবৃত্ত হতো।[১০০]

রাজতন্ত্রের পাশাপাশি কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য ছিল। নাগরাজ্য, অহিচ্ছত্র, অযোধ্যা, কোশাম্বি প্রভৃতি রাজ্যগুলি বাকাটক এবং মৌখরী বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। গণরাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অর্জুনায়ন, মালব, মৌধেয়, শিবি, কুনিন্তস ইত্যাদি। এসব রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটুকু স্পষ্ট পূর্বসূরীদের অনুকরণে এ সব রাজ্যের শাসন পরিচালিত হতো।

গুপ্তযুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ভারত ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। শ্রীগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন গুপ্তযুগে পুলিশ ও গুপ্তচর-ব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা দেয়। গুপ্ত সম্রাটগণ সাম্রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। পুলিশ বা গুপ্তচরের সদাজাগ্রত সতর্ক প্রহরা সাধারণ মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলত না। সকলেরই যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু গুপ্তচর বা পুলিশি-তৎপরতার অনুপস্থিতি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সমসাময়িক বিভিন্ন সূত্র থেকে দক্ষ গুপ্তচর[৯৬] ও পুলিশের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[৯৭] রাজার প্রধানমন্ত্রীকে (সচিব) রাজার 'তৃতীয় নয়ন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৯৮] প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং সচিবের সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী কর্মচারীরা দূত বা দূতক নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণত দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকে দূত বা দূতক নিযুক্ত হতেন। সম্রাটের মুখপাত্র রাজস্থানীয় এবং উপারিকদের মতো দূতরা সম্মানের অধিকারী ছিলেন।[৯৯] বৈন্যগুপ্তের 'গুণাইঘর লিপি'তে রাজার আদেশ লিপিবদ্ধ করার জন্য 'করণকায়স্থ' নামক কর্মচারীর উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তিস্থাপন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বলা হতো 'সান্ধিবিগ্রহিক'।[১০০] 'দণ্ডপাশাধিকরণিক' (head of the police) এবং 'চৌরধরনিক' (Inspector General of Police) পুলিশ দপ্তরে নিযুক্ত ছিলেন।[১০১] দলিল-সংরক্ষণ বিভাগকে বলা হতো অক্ষতপাল। এই দপ্তরের পরিচালনার ভার ছিল মহাক্ষপাটলিকের ওপর। দলিলের লিপিকারদের বলা হতো কর্তৃ বা শাসয়িত্রী। নগরপাল (সর্বাধ্যক্ষ) দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য উচ্চ অভিজাত বংশীয় কর্মচারী (কুলপুত্র) নিযুক্ত করতেন।[১০২] রাজ্যপাল এবং জেলার শাসকদের সহায়তার জন্য নিযুক্ত ছিল দাণ্ডিক, চৌরধরনিক, দণ্ডপাশিক, প্রথমকায়স্থ, পুষ্টপাল ইত্যাদি।[১০৩] গ্রামের প্রহরীকে বলা হতো দণ্ডপাশিক।[১০৪]

গুপ্তযুগে শক্তিশালী পুলিশদপ্তর, সর্বত্র দৃষ্টি রাখার জন্য প্রহরী নিয়োগ, মূল্যবান গোপন দলিল সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর নিয়োগ করা হতো। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, নরসিংহ গুপ্তের দিগ্‌বিজয়, বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং শাসনকার্যে সফলতার মূলে গুপ্তচরদের ভূমিকা ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পুলিশ ও

গুপ্তচরের অকারণ হস্তক্ষেপে যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয় সেদিকে গুপ্তরাজাদের দৃষ্টি ছিল। তারা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং গুপ্তযুগে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিল্প সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আদর্শ বা উদ্দেশ্য যত মহান হোক না কেন বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সে বিষয়ে সবসময় সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কৌটিল্যের* অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত গুপ্তচর-ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ মূলনীতি থেকে অনেকটাই সরে আসে। তবে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রজার মঙ্গলের জন্য শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর নিযুক্ত হতো।** জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় গুপ্তচর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— '.... it is an application of dharma to national defence.'[২০৬] দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সম্রাট অশোক প্রজাদের সুখসুবিধা ও ধর্মপ্রচারের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। অশোক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ রাজন্যবর্গ সমাহর্তা নাগরিক নামক আমলাদের সহায়তায় সর্বত্র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। মনুর বিধান অনুসারে অশোক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ নৃপতিগণ মাঝে মাঝে রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন। এ ছাড়াও বল্লভগ্নসঞ্চারিন নামক দূতগণ রাজার আদেশ প্রাদেশিক শাসনকর্তা, নগর ও গ্রামের শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে যেতেন।[২০৭] রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঘোড়সওয়ার ও বার্তাবাহক নির্দিষ্ট দূরত্বে একে অপরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে যথাস্থানে পৌঁছে দিত। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে ইবন বতুতা ডাকপ্রেরণের এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তবে অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এই প্রথার প্রচলন ছিল।[২০৮]

হর্ষবর্ধনের যুগ

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে গুপ্তচর-ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। অশোকের মতো হর্ষবর্ধন প্রজাদের অবস্থা এবং শাসনব্যবস্থার খোঁজখবর নিতে নিয়মিত পর্যটনে যেতেন।[২০৯] হিউয়েন সাং বলেন একশ্রেণির সংবাদ-বাহক ব্যবসাবাণিজ্যের আদানপ্রদান সম্পর্কে খবর নিয়মিতভাবে সম্রাটের কাছে পেশ করত।[২১০] বাণভট্টের *হর্ষচরিতে* সঞ্চারক ও সর্বঘট নামক কর্মচারীর উল্লেখ আছে। এই দুইশ্রেণির কর্মচারী বিশ্বস্ত বার্তাবাহক ছিল। তারা সম্রাটকে জনমত, জনগণের অবস্থা এবং রাজার বিরুদ্ধে সমালোচনা সম্পর্কে সমস্ত খবর জানাত।[২১১]

হর্ষবর্ধনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও গুপ্তচরদের কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও সমাজ ও শাসনব্যবস্থায়

---

* 'The overall picture of Kautilya espionage was not perhaps applicable with equal exactness to all the periods of ancient India.'[২০৫]

** ভারতীয় ঐতিহাসিক A. L. Basam বলেন, 'The function of the secret service was not confined to the suppression of criticism and sedition in India, and it was looked on not as a mere Machiavellian instrument for maintaining power, but an integral part of the state machinery.'

অবক্ষয় দেখা দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এই অধঃপতনের সূচনা হয়। সম্রাট হর্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই অধঃপতন রোধ করতে পারেননি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি লেগেই থাকত। স্বয়ং হিউয়েন একবার দস্যুহস্তে পতিত হন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি আশ্চর্যভাবে বেঁচে যান। প্রয়াগে উৎসবের শেষে একবার হর্ষবর্ধনের জীবননাশের চেষ্টা হয়। তবে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।[১২]

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর অনতিকাল পরে উত্তর ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কনৌজ, কাশ্মীর, মগধ এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূটরা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে।

বারাণসীতে ১০৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গাহড়বালদের অভ্যুত্থান হয়। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, দিল্লি থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত ভূখণ্ড এবং হিমালয় পর্যন্ত গাহড়বালদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গাহড়বালদের আধিপত্য অটুট ছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের মহাসান্ধিবিগ্রহিক (minister of war and peace) ছিলেন রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ *কৃতকল্পতরুর* লেখক লক্ষ্মীধর।[১৩] লক্ষ্মীধরের লেখা থেকে এই সময়কালের গুপ্তচর-ব্যবস্থার কথা জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা থেকে গুপ্তচর-প্রথা* কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আজমীরে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে সংস্কৃত নাটক *ললিতবিগ্রহরাজের* কিছু অংশ সংরক্ষিত আছে। তাতে বলা হয়েছে শাকম্ভরীর বিগ্রহরাজের শত্রু হাম্মিররাজ সামরিক শক্তির খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করেন।[১৫] কলহনের *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে গুপ্তহত্যার জন্য তীক্ষ্ণ চর নিয়োগ করার কথা আছে।[১৬]

পাল ও সেনযুগ

বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় বঙ্গদেশের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পাল ও সেনযুগে গুপ্তচর-ব্যবস্থা যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক মন্ত্রীকে বলা হতো মহাসান্ধিবিগ্রহিক। সেনরাজাদের নথিপত্রে মহাসান্ধিবিগ্রহিককে 'দূতক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে যোগ্য এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হতো। বিখ্যাত পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট পূর্ববঙ্গে রাজা হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তার পিতামহ আদিদেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক।[১৭] লেখক নামের কর্মচারীরা আয়ব্যয়ের হিসাবে সংরক্ষণ, আমদানি ও রপ্তানি করা জিনিসপত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করে নথিভুক্ত করত। এছাড়া শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ আধিকারিককে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেরণ লেখকদের কর্তব্য ছিল।[১৮] লেখকদের সাথে গুপ্তচর সংস্থার সঠিক সম্পর্ক কী ছিল তার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। পররাষ্ট্রীয়

---

* Dr. P. C. Chakraborty মন্তব্য করেন, 'In later works on Arthasastra and Niti the functions and disguises of spies are delineated more or less in the pattern of Kautilya.'[১৯]

সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং দূত যেসব রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল সেখানে চর মারফত গুপ্ত খবর সংগ্রহ করতেন।[১১৯] দূত প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন। পররাষ্ট্রের রাজসভায় অবস্থানকালে গূঢ়পুরুষ মারফত দূত ঐ রাষ্ট্রের গোপন খবর সংগ্রহ করতেন।[১২০] গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মচারীরা ছিল খোল, অভিত্তরমান,* গমাগমিক ও দূত প্রৈষনিক। বি. সি. সেন বলেন, খোলদের সঠিক কাজ কী ছিল বলা মুশকিল। অন্যত্র দূতের সঙ্গে খোলের উল্লেখ করা হয়েছে। খোল প্রকৃত অর্থে চর। কিন্তু প্রয়োজনে তাকে উপরাষ্ট্রদূতের কাজ করতে হতো।[১২২] গমাগমিক কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে জরুরি খবর আদানপ্রদান করত।[১২৩] গমাগমিক কূটনৈতিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মতে দূত ও প্রৈষনিক-দুই ভিন্ন পদের অধিকারী।[১২৪] আবার নীহাররঞ্জন রায় বলেন দূত প্রৈষনিক হয় দূত প্রেরণ করতেন অথবা দূতের বার্তা বহন করতেন।[১২৫]

চৌরধরনিক নামক এক শ্রেণির কর্মচারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া দৌষাধনিক নামক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন। ঐতিহাসিক আর. জি. বসাক বলেন এরূপ কর্মচারী গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বি. সরকার বলেন দৌষাধনিক সম্ভবত গুপ্তচর সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) ছিলেন। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে এদের যোগাযোগ থাকলেও মূলত এরা পুলিশ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১২৬]

সেন রাজাদের আমলে গুপ্তচরব্যবস্থার পরম্পরা বজায় থাকলেও সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেন রাজারা চর মারফত মুসলিম আক্রমণের সম্ভাবনা জেনেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন নি। নদীয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা হয়। কিন্তু বক্তিয়ার খলজির আক্রমণ প্রতিরোধ করার সাহস ও যোগ্যতা এদের ছিল না। লক্ষণসেনের রাজত্বকালের শেষদিকে শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, গুপ্তচর-ব্যবস্থাও অকেজো হয়ে যায়। লক্ষ্মণসেন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং কুলীন প্রথার মতো জটিল সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ রাজার পক্ষে এই অরাজকতা দূর করা সম্ভব ছিল না। সেই সুযোগে অতি সহজেই বক্তিয়ার খলজি নদীয়া দখল করে নেন।[১২৭]

দক্ষিণ ভারত

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতে অভ্যন্তরীণ শাসন ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে গুপ্তচরদের পুরোমাত্রায় কাজে লাগানো হতো। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রমাণিত হয় দক্ষিণে পল্লব, চোল, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, কাকতীয় এবং কলচুরি রাজাদের শক্তিশালী সুদক্ষ গুপ্তচরব্যবস্থা

---

* অভিত্তরমান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি. সি. সেন বলেন 'The Abhittaramana's duty was probably to be actively responsible for an expeditious dispatch of official business of either some or all the departments of the state.'[১২১]

ছিল।[২২৮] খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তিরুবল্লুবর *কুরাল ভেনবা* নামক একটি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ে তিনি কৌটিল্যের অনুকরণে গুপ্তচর-ব্যবস্থার আলোচনা করেন।[২২৯] রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করার আগে চরদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভন (virtue-ধর্মোপধা, wealth-অর্থোপধা, lust-কামোপধা, fear-ভয়োপধা) দ্বারা তাদের সততা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[২৩০]

কর্ণাটকে কলচুরি রাজাদের 'করণম' নামক চরের সংখ্যা ছিল পাঁচ। এদের রাজার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সমস্ত বিভাগের সংবাদ এই সংস্থা রাজাকে জানাত। চোল রাজারা মন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষা এবং স্থানীয় রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ তদারকির জন্য পরীক্ষক (auditors) এবং পরিদর্শক (inspectors) নিযুক্ত করতেন।[২৩১] বাকাটক বংশীয় রাজারা অভিজাত ব্যক্তিদের বার্তাবাহক নিযুক্ত করতেন।[২৩২] পল্লবরা এই শ্রেণির কর্মচারীদের মন্ত্রীর দূত (premier's messengers) আখ্যা দিয়েছিলেন। 'আনামকোণ্ডা লিপি'তে কাকতীয় বংশের রাজা রুদ্রদেবের গুপ্তচরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় দশম শতকে জৈনসাধু সোমদেব সুরি কল্যাণীর চালুক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিরুবল্লুবরের বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটক *নীতিবাক্যমত্র* (Niti-vakyamtra)। গুপ্তচরের গুরুত্ব আলোচনাকালে তিনি যে মন্তব্য করেন তার অর্থ 'a king may learn wisdom from a fool as one gets gold from a rock.... and should glean information from spies as a gleaner gets ears of corn.'[২৩৩] রাষ্ট্রকূট রাজাদের সুদক্ষ গুপ্তচর-ব্যবস্থা* ছিল। এই বংশের রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ সামন্ত রাজ্য এবং শত্রুরাজ্যে হাজার হাজার বারবণিতা পাঠাতেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের পরিষেবার জন্য বারবনিতা নিযুক্ত করতে বাধ্য করতেন। এরা কার্যত ছিল গুপ্তচর। সোমদেব বলেন রাষ্ট্রকূট রাজারা দৈহিক পরিচর্যার জন্য বারবণিতা নিয়োগ করতেন। রাজসভায় সুন্দরী নর্তকীরা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করত।[২৩৫] চালুক্যরাজ অনহিলনপওনের রাজসভায় আগত আরব পর্যটক অল ইদ্রিস বারবণিতা ও নর্তকীদের কথা উল্লেখ করেন।[২৩৬]

---

* দক্ষিণ ভারতে গুপ্তচর সম্পর্কে ঐতিহাসিক বার্টন স্টেইন মন্তব্য করেন, 'In the Arthasastra model an autocrat manages what might be a large territory of diverse peoples through administrative specialists augmented by a spy system and agent provocateurs.'[২৩৭]

মধ্য যুগ

মুসলিম যুগ

প্রাচীন ভারতের সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধশালী হলেও এদেশে ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে ওঠেনি।[২৩৭] ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং স্মৃতিশাস্ত্রকেন্দ্রিক।[২৩৮] তবে বিদেশি পর্যটকদের ভারত বিবরণ, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রশাসন এবং মুদ্রা প্রাচীন ভারত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান।[২৩৯] মৌর্যযুগে পূর্ব ভারতে মগধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। কৌটিল্যের রাজনৈতিক গ্রন্থ *অর্থশাস্ত্র* থেকে আমরা ওই সময়ের শাসনব্যবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর সংস্থার গঠন ও কার্যপ্রণালীর যে বিবরণ পাই তার সঙ্গে সমসাময়িক গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। মৌর্য যুগকে গুপ্তচর ব্যবস্থার সুবর্ণ যুগ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজন্যবর্গ *অর্থশাস্ত্র* অনুসরণ করে গুপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করেন। মৌর্যোত্তর যুগে বিভিন্ন সময়কালের গুপ্তচর প্রসঙ্গে প্রামাণ্য উপাদান বাণভট্টের *হর্ষচরিত*, বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস*, বাক্‌পতির *গৌড়বহো*, কহ্লনের *রাজতরঙ্গিণী*, বিল্‌হনের *বিক্রমাংকচরিত*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ এবং ইৎ-সিনের ভারত বিবরণ সমকালীন ভারত ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

ভারতবর্ষে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম শাসকবর্গ এদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উন্নত বাইজানটাইন, রোমান এবং পারসিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন।[২৪০] মুসলিম শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল গুপ্তচর। মুসলিম শাসকদের গুপ্তচর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ভারতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের অভিপ্রায় ও কার্যকারিতা পৃথক ছিল। আক্রমণকারী মুসলিমরা আগ্রাসী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হতেন। সাম্রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা প্রথমেই বিভিন্ন রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান, রাস্তাঘাট, সামরিক শক্তির পরিমাণ, শাসকগোষ্ঠীর প্রতি জনসাধারণের মনোভাব ইত্যাদি বিষয় অনুধাবনের জন্য বিশ্বস্ত কর্মতৎপর কুশলী গুপ্তচর পাঠাতেন। গুপ্তচরদের সহায়তায় ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিচ্ছিন্নতা ও দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা সহজেই এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম শাসকগণ এদেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে

শাসনব্যবস্থা গঠন করেন। বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মচারী, বিচারক, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, রাজস্ববিভাগের বিভিন্ন কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতিপরায়ণ না হয়ে ওঠে তার জন্য সুলতান বিশ্বস্ত এবং যোগ্য গুপ্তচরের মাধ্যমে সমস্ত খবর সংগ্রহ করতেন। গজনীর সুলতান মামুদের অনুকরণে এদেশে সুলতানি গুপ্তচর ব্যবস্থা সংগঠিত হয়।[৪১] সরকারি আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করলে গুপ্তচর এবং প্রতিবেদকের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রতিবেদনে বাধার সৃষ্টি হতে পারে ভেবে সুলতানগণ এদের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আমলা এবং অভিজাতবর্গ গুপ্তচরদের যাতে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হতো। সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সুলতানি শাসনব্যবস্থায় শাসক ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার ছিল গুপ্তচর।[৪২]

সুলতানি যুগ

দিল্লির সুলতানি শাসনে কেন্দ্র ও প্রদেশে Barid-i-mamalik (commissioner of intelligence) নায়েব নামক কর্মচারীর সহযোগিতায় বারিদ (গুপ্তচর) নিযুক্ত করতেন। এরা আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহ করত। প্রদেশে রাজধানী শহর এবং নগরের খবর সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল Akhbarnaris।[৪৩] জিয়াউদ্দিন বারনি সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের বারিদ (গুপ্তচর)-এর কথা উল্লেখ করেন। এরা যাতে সুষ্ঠুভাবে সততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এদের কর্মক্ষেত্রের পরিসর সীমিত করা হয়।[৪৪] ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি সুলতানের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বারিদরা আমলা, অভিজাত এবং আত্মীয়বর্গের গতিবিধি ও কার্যকলাপের সমস্ত খবর সুলতানকে জানাত। ফলে স্থানীয় শাসক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিরপরাধ মানুষকে অত্যাচার করার সাহস পেত না।[৪৫] গিয়াসুদ্দিন বলবন পুত্র বুগরা খানকে সামান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার গতিবিধি ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখত সুলতানের বারিদ। বদায়ুনের শাসনকর্তা সুলতানের অধীনস্ত জনৈক কর্মচারীকে হত্যা করেন। বদায়ুনে সুলতান নিযুক্ত বারিদ যথাসময়ে তাকে এই সংবাদ না দেওয়ায় তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[৪৬]

আলাউদ্দিন খলজি পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। সুলতানের গুপ্তচরদের বলা হতো munhis. (সমাজের উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষ এবং সরকারি কর্মচারীদের খুঁটিনাটি সমস্ত খবর সুলতানের কর্ণগোচর করত।) আলাউদ্দিন আমলা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।[৪৭] বাস্তবে তার গুপ্তচর সংস্থা নিপীড়ন যন্ত্র হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের বাড়িতে হানা দিয়ে আলাউদ্দিনের গুপ্তচররা তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত।

সুলতান নিজে মদ্যপান বন্ধ করে সমস্ত পানপাত্র ভেঙে ফেলেন এবং রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন।[৪৮] বাজারদর নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন তিন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করেন, যথা— ক. অধিকর্মা (superintendent) বাজারে আমদানিকৃত দ্রব্যের পরিমাণ ও দরের তালিকা তৈরি করতেন। খ. বারিদ-অধিকর্মা-প্রদত্ত তালিকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন। গ. গুপ্তচর (munhis) ঐ তালিকা সুলতানের কাছে পেশ করত। এই তিন জনের প্রতিবেদনে অসংগতি থাকলে অধিকর্মাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।[৪৯]

মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য উপাদান আফ্রিকা নিবাসী পর্যটক Ibn-Batutah-র লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থ *Rehla* এবং শাহাবুদ্দিন আব্বাস আমেদের *Masalikul-Absar-Fi-Mamalik-ul-Amsar*। Ibn Batutah সুলতানি গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। রাজ্যের সমস্ত খবর, এমনকি রাস্তায় বা বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের পরস্পর কথোপকথন প্রয়োজনে নথিভুক্ত করা হতো। Ahmadও সুলতানের গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে এই একই মত ব্যক্ত করেন।[৫০]

দিল্লির সুলতানি শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘটনাপঞ্জির নথিভুক্তকরণ। সুদক্ষ সুলতানগণ রাজকর্মচারী, প্রতিবেদক ও গুপ্তচরদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্রতিবেদক (news writers) প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী সুলতানদের সাথে মিথ্যাচার করত না।[৫১]

মুঘল যুগ

মুঘল শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর সংস্থার কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়। আমজনতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গুপ্তচর বিভাগে সরকারি প্রতিবেদকের (official recorder) একটি নতুন শাখা খোলা হয়। আকবরের সভাকবি আবুল ফজল সরকারি প্রতিবেদনের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫২] সম্রাট আওরঙ্গজেব গুপ্তচরের কর্মতৎপরতা ও খবর সংগ্রহ এবং নথিভুক্তকরণের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, শাসকের অজ্ঞতা ও অসাবধানতা শাসক ও সাম্রাজ্যের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। শিবাজীর পলায়ন এরূপ একটি ঘটনা। সম্রাটের অজ্ঞতা ও গুপ্তচরদের অসাবধানতার মাশুল সম্রাটকে সারা জীবন বহন করতে হয়।[৫৩]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বিভিন্ন তথ্য ভিত্তি করে মুঘল গুপ্তচর সংস্থার গঠন সম্পর্কে এক চিত্র তুলে ধরেছেন। মুঘল গুপ্তচর বিভাগের কর্মীরা লিখিত ও মৌখিকভাবে সম্রাটের দরবারে তাদের প্রতিবেদন জানাত। লিখিত প্রতিবেদন পেশ করত যথাক্রমে :

ক. Waqai-navis or waqvainigar, a writer or surveyor of events.

খ. Sawanih-navis or sawanih-nigar also a recorder of events.

গ. Khufia-navis a secret writer.

মৌখিক সংবাদদাতাকে বলা হতো harkarah. এরা সরকারি গোপন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করত। মূলত harkarah ছিল গুপ্তচর।[৫৪] মুঘল গুপ্তচর সংস্থার প্রতিবেদন ছিল নিম্নরূপ :

ক. Waqai or news letters

খ. Sawanih or khufia or secret news letters

গ. Akhbars or news reports

ঘ. Roznamchas or daily reports

Waqai এবং Sawanih বা Khufia সরকারি দলিলরূপে প্রতিপন্ন হয়। Waqai-navis, sawanih-navis বা khufia-navies তাদের অধস্তন কর্মচারী (akhbar-navis) দের সংগৃহীত দৈনন্দিন খবর (akhbars and roz namcha) এর ওপর ভিত্তি করে সরকারি দলিল (waqai and sawanis) প্রস্তুত করতেন।[৫৫]

সর্বজনীন ও গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের এ পদ্ধতি মুঘল শাসনব্যবস্থায় কোন সময় থেকে প্রবর্তিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে তা প্রযুক্ত হতো কিনা, সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু সমসাময়িক তথ্য থেকে এর কার্যকারিতার প্রমাণ মেলে। গোলাম হোসেন-এর *Syar-ul-Mutakherin* গ্রন্থে আওরঙ্গজেব ও তার উত্তরাধিকারীদের গুপ্তচর ব্যবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা উপরোক্ত পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছিল।[৫৬]

সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মুঘল শাসকের রাজত্বকালে গুপ্তচর সংস্থার কিছুটা রূপান্তর ঘটলেও মূল কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে যায়। সম্রাট আকবর গণমাধ্যম-এর প্রতিনিধিরূপে waqai-navis (public news writers) নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন সুবায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপনভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে গুপ্তচর বিভাগে গোপন প্রতিবেদক (secret news writers)-এর পৃথক বিভাগ খোলা হয়।[৫৭]

সম্রাট আকবর সর্বসাধারণের সংবাদ এবং গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য সুদক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতার গুপ্তচর ব্যবস্থা বহাল রাখেন।[৫৮] Mirza Nathan *Baharistan-i-Ghaibi* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর গুপ্তচরদের মাধ্যমে সুবার শাসকদের গতিবিধি ও কার্যাবলীর খবর সংগ্রহ করতেন। এরা লিখিত রিপোর্ট সম্রাটের দরবারে পেশ করত। সুবা বাংলায় (১৬০৮-১৩) অধিকর্তা ছিলেন ইসলাম খান। জাহাঙ্গীর Yugma Isfahani-কে সেখানে waqai-navis নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান কুচ-এর অধিপতি পরীক্ষিৎকে পরাজিত করে তার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি Isfahani-কে এই ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করে সম্রাটের দরবারে পেশ করতে বলেন।[৫৯] সুলতানি ও মুঘল শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রেকর্ড করে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় আমরা ঐ সময়ের ইতিহাস রচনার বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই।

Waqai-navis এবং sawanih-navis বা sawanih-nigar নামক কর্মচারীরা সংবাদ আদানপ্রদান করত। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। waqai-navis ছিল জনসংযোগের মাধ্যম (public news writers). sawanih-navis গুরুত্বপূর্ণ গোপন সংবাদ

প্রতিবেদকরূপে (secret news writers) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করত। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার *Mirat-i-Ahmadi* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'the sawanih-navis was intended to be a spy and a check on the waqai-navis.'[২৬০] waqai-navis অনেক সময় অর্থের লোভে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে কেন্দ্রীয় দরবারে মিথ্যা খবর পাঠাত। এদের তুলনায় sawanih-navis ছিল অনেক বিশ্বস্ত। waqai-navis-দের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব এদের ওপর অর্পণ করা হয়।[২৬১] কালক্রমে waqai-navis এবং sawanih-navis-এর কর্মক্ষেত্র একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। sawanih-navis প্রাদেশিক ডাকবিভাগে পরিদর্শকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনার দায়িত্ব harkarah নামক প্রতিবেদকের হাতে ন্যস্ত হয়।[২৬২]

মুঘল শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মপদ্ধতি

আকবরের সভাসদ আবুল ফজল waqai-navis-দের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেছেন। আকবরের শাসনকালে waqai-navis সম্রাটের আদেশ, বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তার বক্তব্যের প্রতিলিপি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মীরবক্সির কাছে জমা দিতেন। মীরবক্সি এই প্রতিবেদন সংশোধন ও পরিমার্জিত করে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য দাখিল করতেন। সম্রাট অনুমোদিত রিপোর্ট নকল করে মীরবক্সি তাতে নিজের সই দিয়ে তিনটি প্রতিলিপি parwanchi, মীর আরজ্ এবং সম্রাট অনুমোদিত বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কাছে পাঠাতেন। এই রিপোর্টকে বলা হতো yaddasht (স্মারকলিপি)। এই স্মারকলিপির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুন্দর হস্তাক্ষর যুক্ত নকলনবিশ দ্বারা নকল করে waqai-navis-কে দাখিল করা হতো। waqai-navis, risala (i.e. risaladar) mir arz ও darogha এই প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করে শিলমোহরের ছাপ দিয়ে রাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জমা দিতেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষর ও শিলমোহরযুক্ত এই স্মারকলিপিকে বলা হতো তালিকা।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় waqai-navis-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে পর্যটক বার্নিয়ার বলেন 'their (waqai-navis) business is to communicate every event that takes place.'[২৬৩] চিকিৎসক Dr. Fryer waqai-navis-কে লেখ্য প্রামাণিক (Public Notaries) হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৬৪] পর্যটক মানুচি বলেন সপ্তাহে একবার waqai-navis এবং khufia-navis গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্রাটের কাছে পেশ করতেন। রাত্রির প্রথম প্রহরে অন্দরমহলের বিশিষ্ট মহিলা এই সংবাদ সম্রাটকে পড়ে শোনাতেন।[২৬৫] কেন্দ্র ও প্রদেশে waqai-navis-এর কর্মক্ষেত্র ছিল সুদূরপ্রসারী এবং তারা তাদের কাজের জন্য একমাত্র সম্রাটের কাছে জবাবদিহি করতেন।[২৬৬]

Waqai-navis এবং sawanih-navis-দের নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য হতে হতো। রাজবংশোদ্ভূত ব্যক্তি, অভিজাত শ্রেণি, স্থানীয় অধিকর্তা বা পদস্থ রাজকর্মচারীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করলে waqai-navis এবং sawanih-navis-কে বরখাস্ত করা হতো। বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে মুয়াজ্জমের পুত্র মুইজুদ্দিন (পরবর্তী কালের জাহান্দার শাহ)

জনৈক waqai-navis-কে উচ্চ মনসব প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। বাদশাহ মুইজুদ্দিনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ waqai-navis-কে বদলির হুকুম দেওয়া হয়।[৬৭]

অনেক সময় সুবা এবং সামরিক বাহিনীতে একই ব্যক্তি waqai-navis এবং বক্সির পদে অধিষ্ঠিত হতেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ওড়িশায় মুহম্মদ হুসেন মাহিরি একই সঙ্গে দুটি পদের দায়িত্ব পান।[৬৮] গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে মীর আবদুল জালিল একই সঙ্গে দুটি পদ অলংকৃত করেন।[৬৯]

Waqai-navis এবং Khufia-navis ছাড়া বাদশাহরা ব্যক্তিগত গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। সরকারি প্রতিবেদকদের মতো এদের পদমর্যাদা ছিল না। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত গুপ্তচরের সংখ্যা পূর্ববর্তী শাসকদের চাইতে অনেক বেশি ছিল। এরা গোপনে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে রাজকর্মচারী এবং রাজবংশীয় সদস্যদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের বিবরণ সপ্তাহে একদিন সম্রাটকে জানাত।[৭০]

গুপ্তচর বিভাগে নগর পুলিশ কোতোয়াল Halal Khor (house scavenger) নামক গুপ্তচরদের মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণ করতেন। মানুচির বিবরণ থেকে জানা যায় সপ্তাহে দুদিন সাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাসগৃহ পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত halal khor সমস্ত খবর কোতোয়ালকে জানাত এবং পক্ষান্তরে কোতোয়াল তা সম্রাটের কর্ণগোচর করত।[৭১]

মুঘল সম্রাটগণ নারী গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। আওরঙ্গজেব মুয়াজ্জমের প্রাসাদের অন্দরমহলে হামিদাবানুকে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন 'She was the highest female servant, a sort of female major demo and acted as a spy.' ১৬৯৬-৯৮ পর্যন্ত মুয়াজ্জম মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। হামিদা বানু সম্রাটকে জানান মুয়াজ্জম প্রতি রাতে নিজের শয়নকক্ষে লেখনি (pen case) এবং স্মারকলিপি নিয়ে প্রবেশ করেন। হামিদাবানু ছাড়াও অন্যান্য চরেরা সর্বদাই মুয়াজ্জমের ওপর নজর রাখত।[৭২]

Waqai-navis এবং Khufia-navis (sawanih-navis)-দের মতো গুপ্তসংবাদ প্রতিবেদক[৭৩] হরকরাদের অধীনে ছিল akhbar-navis (informers)।

অসামরিক শাসনব্যবস্থা ছাড়া সামরিক ক্ষেত্রে গুপ্তচর সৈন্যবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত হতো। সামরিক অভিযান এবং বিদেশে প্রেরিত দূতদের সাথে Waqai-navis কে পাঠান হতো। তিনি সৈন্যসমাবেশের বিস্তৃত বিবরণ সম্রাটকে পাঠাবার আগে সমরবাহিনীর প্রধানকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতেন।[৭৪]

ডাকচৌকি-দারোগা-ডাকবিভাগ ও গুপ্তচরের বিন্যাস

চার শ্রেণির প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্রতিবেদকদের প্রধান ছিলেন Daroghai-dakchouki। তিনি কর্তব্যপরায়ণ সৎ প্রতিবেদকদের দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের রোষ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। কেন্দ্রীয় ডাকবিভাগের ন্যায় প্রাদেশিক ডাকবিভাগ ছিল। ডাকবিভাগের প্রধান অধিকর্তাকে বলা হতো দারোগা। দারোগা ছিলেন বিশ্বস্ত এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী। কেন্দ্রের

সঙ্গে এরা প্রদেশের সংযোগ রক্ষা করতেন। কেন্দ্রীয় দারোগার দপ্তরে জমা পড়ত সম্রাটের farman, shuqqa, nisan, hasb-ul-hukum, sanad, parwana এবং দস্তক। প্রাদেশিক waqai-navis এবং kufia-navis প্রেরিত প্রতিবেদনের অনুলিপি দারোগার দপ্তরে জমা পড়ত। এগুলি খামবন্ধ অবস্থায় সম্রাটকে পেশ করার জন্য দারোগা Wazir-এর হাতে জমা দিতেন।[৭৫] আরবের আববাসিদ বংশীয় সুলতানদের মতো মুঘল বাদশাহগণ শাসনকার্যের সমস্ত বিভাগ, জনসাধারণ এবং রাজপরিবারের সদস্যদের ওপর নজর রাখার জন্য বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। পক্ষান্তরে, সম্রাটের গতিবিধি ও কার্যকলাপের খবর সংগ্রহের জন্য রাজকর্মচারী এবং রাজপরিবারের সদস্যগণ গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। সাধারণত বণিক, ফেরিওয়ালা, গৃহভৃত্য, চিকিৎসক এবং পরিচারিকা গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত হতো।[৭৬]

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী মুসলিম শাসকগণ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৭৭] বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী গুপ্তচর সংস্থার কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করা হতো। মুসলিম শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রেকর্ড করে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অনেক তথ্যপ্রমাণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। পারসিক বিবরণ, বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনি, পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ফ্যাক্টরি রেকর্ড থেকে আমরা মুঘল শাসনব্যবস্থার আংশিক চিত্র পাই। তবে এগুলি যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশে গোয়েন্দা এবং গুপ্তসংবাদ বিভাগের প্রতিবেদক ও চরের সংখ্যা সঠিক জানা যায় না। Danishmand Khan-এর মতে ১৭০৮-৯ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে গুপ্তচরের সংখ্যা ছিল চার হাজার। কিন্তু এই হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৮] কারণ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার (১৭৫৩-৭৫) harkarah (messengers) এবং গুপ্তচরের সংখ্যা ছিল ২২০০০।[৭৯] Father Francois Catrou বলেন মুঘল সম্রাটের অসংখ্য গুপ্তচর সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকত। সম্রাট অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এই চরবাহিত রিপোর্টগুলি পড়তেন। মানুচির মতে যে কোনো দেশের চাইতে মুঘল গুপ্তচর সংস্থা ছিল অনেক বেশি সুগঠিত। 'Aurangzeb had such good spies that they knew (if it may be said) even men's very thoughts.'[২৮০] এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এত সুদক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ছায়া কেন ঘনিয়ে এসেছিল ? পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল।

বাস্তবে মুঘল শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর সংস্থার কার্যকলাপ

মুঘল গুপ্তচর ব্যবস্থা বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয় তার কিছু নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। গুপ্তচর সংস্থার কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্যকলাপ, অভিজাত শ্রেণি ও রাজপুত্রদের গতিবিধির সমস্ত খবর তারা নির্ভয়ে সম্রাটকে জানাত।

একবার আওরঙ্গজেবকে উচ্চপদস্থ এক দেওয়ান জানালেন জৌনপুরের আমিন সৈয়দ মীর হবিবুল্লাহ সরকারি তহবিল থেকে ৪০,০০০ টাকা অপব্যয় করেছেন। এই খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য সম্রাট জৌনপুরে এক গুপ্তচর পাঠিয়ে জানতে পারেন সৈয়জ ঐ অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করেছেন।[৮১] গুপ্তচরদের সততা ও তৎপরতায় অনেক সময় সত্য উদ্‌ঘাটিত হবার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এক শ্রেণির রাজকর্মচারী (called newrahs) সরকারি চিঠিপত্র, গুপ্তচরদের প্রতিবেদন এবং সম্রাটের উপঢৌকন পাঠাবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। এদের যাতায়াতের পথে যে সব গ্রাম ছিল সেখানকার কৃষকদের ওপর এদের অত্যাচারের কাহিনি অনেক সময় সম্রাটের দরবারে গুপ্তচর মারফৎ পৌঁছে যেত।[৮২]

আওরঙ্গজেবের সরকারি চিঠিপত্র থেকে জানা যায় মালাবার অঞ্চলের স্থানীয় অধিকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৮৩]

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের বিভিন্ন খবর, বিপর্যয় ইত্যাদি খবর গুপ্তচর সম্রাটের কর্ণগোচর করে।[৮৪]

নানদের প্রদেশের গুপ্তচরদের প্রতিবেদন থেকে আওরঙ্গজেব জানতে পারেন Sayyid Hasan Ali Khan Barah (later Abdullah Khan Wazir of Farrukhsiyar) মারাঠা অধিনায়ক হনুমন্ত-এর সাথে সংঘর্ষে তাকে পরাজিত করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। জুলফিকর খান এই খবর সম্রাটের কাছে ডাকে (relays of couriers) পাঠান।[৮৫]

চর মারফৎ সম্রাট জানতে পারেন মারাঠা রাজা রামচন্দ্রের প্রধান উপদেষ্টা (peshdast) পরশুরাম খেলনা দুর্গ মুঘলদের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে ত্রিম্বক ইঙ্গলে পরশুরামকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৮৬] আওরঙ্গজেবের বিভিন্ন চিঠিপত্রে মাতারার নামক এক গুপ্তচরের কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৭]

Dr. Yusuf Husain Khan বলেন হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিসে সংরক্ষিত বিভিন্ন Roznamchas (news letters) থেকে ১৬৬০-৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের ১৪টি অঞ্চল হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, রামগির, বেরার, পারেন্দ্, আহম্মদনগর, কল্যাণ, ফতেবাদ, সুপা, বাগলানা, উদ্‌গির, জুনার ও জালনার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসনব্যবস্থার কথা জানা যায়।[৮৮] জলদস্যু দ্বারা মীরজুমলার জাহাজ লুণ্ঠন, সুজার পতন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় শিবাজীর কার্যকলাপের বিবরণ এই waqai (news letters) থেকে জানা যায়। এ ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রা, সোনা রূপার ক্রয়বিক্রয় মূল্য, বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় মূল্য, বাজার দর ইত্যাদি অনেক খবর এই waqai থেকে জানা যায়।[৮৯]

মুঘল গুপ্তচর ব্যবস্থার মূল্যায়ন

মুঘল গুপ্তচর ব্যবস্থার সুদক্ষ পরিচালনা ও কার্যকলাপের বেশ কিছু নজির পাওয়া যায়।[৯০] The successful working of the system pre-supposed the indepen-

dence and integrity of the news-reporter who could write without fear or favour. So he did not minimise or conceal the faults of the governors, princes or nobles.'[২৯১]

বাদশাহ আকবর গুপ্তচর প্রদত্ত সংবাদের ওপর নির্ভর করে বেশ কিছু দুর্নীতিপরায়ণ, অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে শাস্তি দেন, যথা—

ক. পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হুসেন কুলি খান মহরমকে দুর্নীতির অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়।

খ. দিল্লির খাজনা আদায়কারী অধিকর্তার (amalguzar) বিরুদ্ধে জনতার অভিযোগ সম্রাটের দরবারে পৌছয়। এই ঘটনার তদন্তের জন্য আকবর গুপ্তচর এবং অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেন।

গ. থানেশ্বরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী (Karori) শেখ সুলতান জনসাধারণকে অত্যাচারের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ঘ. আবদুর রহিম খান-ই খানান-এর পুত্র (বৈরাম খাঁন-এর পৌত্র) একজন কাজিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। গুপ্তচর মারফৎ এই খবর শুনে আকবর তাকে কারারুদ্ধ করেন।

ঙ. গুজরাটের সদর হাজি ইব্রাহিম শিরহিন্দ-এর বিরুদ্ধে চর এবং জনসাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

চ. সম্রাট আকবর কাশ্মীর ভ্রমণকালে Amir Fathulla Shiraji মারফৎ জানতে পারেন শিয়ালকোট অঞ্চলে Sadiq Khan-এর প্রতিনিধি Shiqdar Allah Bardi প্রজাদের ওপর নির্যাতন করেন। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে Amir Fathulla Khan -কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।[২৯২]

সুরাটে পর্যটক Hawkins-কে জনৈক কর্মচারী Mukarrab খান অপমান করেন। Hawkins সম্রাট জাহাঙ্গীরকে এই কথা জানালে তিনি বলেন যে এই খবর তিনি waqai-navis-এর কাছ থেকে আগেই শুনেছেন। Hawkins সম্রাটের গুপ্তচর ও প্রতিবেদকের তৎপরতায় বিস্মিত হন।[২৯৩]

Waqai-navises এবং Sawanih-nigars (public and secret reporters) স্থানীয় শাসকদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের সমস্ত খবরই সম্রাটকে জানাতেন। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রজা নির্যাতনের অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচর হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সৈয়দ খানের খোজাদের হাতে প্রজানিগ্রহের কথা শুনে জাহাঙ্গীর তাকে সতর্কবার্তা পাঠান। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্রাট তার প্রিয়পাত্র Mukarrab Khan-কে নিষ্ঠুরতার অপরাধে মনসবদারের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তট্টার শাসনকর্তা Mirza Rustam-এর বিরুদ্ধে প্রজা নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার যথাযথ তদন্তের

পর সম্রাট তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। জৌনপুরের অধিকর্তা Chin Oilich Khan-কে এই একই অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়। ওড়িশার শাসক রাজা কল্যাণের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ উঠলে সম্রাট তদন্তের নির্দেশ দেন। তবে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়ায় সম্রাট তাকে মুক্তি দেন। জনৈক Bakshi-র (reporter) কাছে গুজরাটের শাসনকর্তা Abdullah-Khan-Firoz Khan-এর দুর্নীতির রিপোর্ট পান। Dayanat Khan-কে এই বিষয়ে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। এমনকি পুত্র শাহজাহানের অধস্তন কর্মচারীদের হাতে ইংরেজ বণিকদের নিগ্রহের খবর শুনে জাহাঙ্গীর তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন।[১৯৪] স্থানীয় শাসকদের দুর্নীতির অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাদের জায়গির কেড়ে নেওয়া হতো। এছাড়া অপরাধ গুরুতর হলে শাস্তি আরও কঠোর এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো।

ক্ষমতা অপপ্রয়োগের অপরাধে সম্রাট রাজকর্মচারী অভিজাত রাজপরিবারের সদস্য এমনকি রাজপুত্রকেও রেহাই দিতেন না।[১৯৫] নূরজাহানের waqai-navis Mir Nasir-কে শাহজাহান সম্রাটের কারখানায় (local imperial Karkhana) পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তিনি শাহজাহানকে জানান দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা আওরঙ্গজেব, রাজকারখানার সমস্ত দক্ষ অভিজ্ঞ কর্মীদের নিজের কারখানায় কাজ করার আদেশ দেন। এতে রাজকারখানা এবং জাহানারার ব্যক্তিগত কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শাহজাহান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে ডেকে পাঠান। আওরঙ্গজেবকে এই ব্যাপারের জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল।[১৯৬]

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অপরাধ ছাড়াও সামাজিক ও নৈতিক অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তিদানের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এক কাশ্মিরি রমণীর শ্লীলতাহানির অপরাধে সম্রাট আকবর হাফিজ কাশিম নামে এক ব্যক্তিকে অভিনব শাস্তির (castration) ব্যবস্থা করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে Cambay-র শাসক Mukarrab Khan-এর ভৃত্য জনৈক বিধবার কন্যাকে অপহরণ ও হত্যা করে। ঐ ভৃত্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। Mukarrab Khan-এর মনসব বাজেয়াপ্ত করা হয়। সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তা Izzat Khan এক ধনী বণিকের কন্যার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হন। জনৈক Waqai-navis-এর কাছে এই খবর শুনে জাহাঙ্গীর তাকে পদচ্যুত করেন।[১৯৭]

Ahkam-i-Alamgiri গ্রন্থে প্রতিবেদক (news writers) এবং গুপ্তচরদের নির্ভীকতা এবং সততার প্রশংসা করা হয়েছে। রাজপুত্র এবং অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, হঠকারিতা, কর্তব্যে অবহেলা, বেআইনি কার্যকলাপ, সীমান্ত শাসনকর্তাদের অসতর্কতার সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনার সমস্ত কথাই তারা সম্রাটকে জানাতেন। এবং সম্রাট দুর্নীতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে প্রয়াসী হতেন।

কিন্তু গুপ্তচরবিভাগের কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিল অসাধু এবং অকর্মণ্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা মিথ্যাচার এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিত। দিল্লি থেকে দূরে অবস্থিত

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিবেদক ও গুপ্তচর অনেক সময় অর্থের লোভে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে কেন্দ্রীয় দরবারে ভুল তথ্য পরিবেশন করতে দ্বিধা করত না। এভাবে ব্যক্তিস্বার্থ রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধনে প্রধান পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।[৯৮]

প্রতিবেদক ও গুপ্তচরদের মিথ্যাচারের ফলে শাসনক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এরকম বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা মানসিংহ ওড়িশা অভিযানকালে পুত্র জগৎসিংহকে বাহাদুর খানের নেতৃত্বে আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। স্থানীয় একজন জমিদার জগৎ সিংহকে বাহাদুর খান-এর বিরুদ্ধে আফগানদের সৈন্য সমাবেশের কথা জানান। জগৎ সিংহ আফগানদের গতিবিধির খবর সংগ্রহের জন্য কয়েকজন গুপ্তচর পাঠান। এদের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে জগৎ সিংহ যথাসময়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করেন। সেই সুযোগে আফগান বাহিনী বাহাদুর খান-এর সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে।[৯৯]

প্রতিবেদক, চর এবং স্থানীয় শাসনকর্তাদের নির্লজ্জ জোট পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। পর্যটক বার্নিয়ার-এর অভিযোগ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।[১০০] তিনি বলেন এই অশুভ আঁতাতের ফলে অত্যাচারের শিকার হতো নিরীহ সাধারণ মানুষ। Waqai-navis-দের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সম্রাট Sawanih-nigar বা Khufia-navis নিযুক্ত করেন। কিন্তু এর ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। জনৈক ফরাসি পর্যটক এবং ভেনেশীয় চিকিৎসক মানুচি উল্লেখ করেন, পদস্থ কর্মচারীরা অর্থের প্রলোভনে অন্যায় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না। ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে এরা সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কথা ভাবত না। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে সংস্কার প্রবর্তন করলেও সম্রাটের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতার অভাবে অনেকসময় তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হতো না। সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য যুদ্ধ নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে লোভী, স্বার্থপর প্রতিবেদক, গুপ্তচর এবং আমলাদের অশুভ আঁতাত প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি।

দুর্নীতির জাল সামরিক, অসামরিক সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ চিকিৎসক Dr. Fryer Waqai-navis-দের (Public Notaries or Public intelligensers) অপদার্থতা, মিথ্যাচার ও অসৎ আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। এরা ছিল একদিকে সম্রাটের বেতনভোগী এবং অপরদিকে আমলাদের উৎকোচ দ্বারা পরিপুষ্ট। ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এরা সমস্ত ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না। সামরিক, অসামরিক সর্বত্রই এই প্রতারকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।[১০১] সামরিক শক্তির ভুলে তথ্য পরিবেশনের ফলে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটে এবং অদূর ভবিষ্যতে তা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১০২]

প্রতিবেদক ও গুপ্তচরদের দুর্নীতি ও ধ্বংসাত্মক আচরণের কথা বিদেশি পর্যটক ছাড়া আওরঙ্গজেবের দুই সুযোগ্য সামরিক অধিনায়ক মীর্জা জুমলা এবং মীর্জা রাজা জয়সিংহ উল্লেখ করেন। এমনকি স্বয়ং সম্রাট নিজেও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। কিন্তু

দুর্নীতি এতই ব্যাপক হয়ে ওঠে যে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা স্বয়ং সম্রাটেরও ছিল না। শক্তির প্রধান উৎস সেনাবাহিনীতে পঞ্চম বাহিনীর উপস্থিতি (Fifth Columnist in modern terminology) সাম্রাজ্যের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। জয়সিংহ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে সম্রাটকে জানান যে হরকরা (গুপ্তচর) বাহিত সংবাদের দশভাগের এক ভাগও সত্য নয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ করেন মিথ্যাবাদী, লোভী, স্বার্থপর, শত্রু সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই। অধিক অর্থের প্রলোভনে এরা পরোক্ষভাবে শত্রুর চরদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩০৩] এ সব তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগ থেকে শাসনব্যবস্থার সমস্ত বিভাগের পরিকাঠামোয় ঘূণ ধরে এবং মুঘল বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

সামরিক-বিভাগে গুপ্তচর

সামরিক বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গুপ্তচর। মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করল তখন থেকেই শুরু হল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।[৩০৪] গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উভয় পক্ষের দলপতি গুপ্তচরের মাধ্যমে একে অপরের সামরিক শক্তি যাচাই করত। গোষ্ঠীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গোষ্ঠীনেতা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কালক্রমে আত্মরক্ষা ও রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে যুদ্ধ। সেইসঙ্গে শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা পরখ করার জন্য গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলতেই থাকত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে পৃথক সামরিক বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না।[৩০৫]

প্রাচীন ভারতে তিন শ্রেণির রাজ্য ছিল : মণ্ডল (circle of states), মধ্যম (mediatory) এবং উদাসীন (neutral)। মণ্ডল বিজিগীষু (conquering) রাজ্য, প্রতিবেশী শত্রু ও মিত্ররাজ্য, উভয় রাজ্যের মিত্র ও শত্রুরাজ্য, দূরবর্তী অঞ্চলের মিত্র ও শত্রু রাজ্য এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষার্থে সংঘবদ্ধ রাজ্য নিয়ে গঠিত হতো। মধ্যম ও নিরপেক্ষ রাজ্যসমূহ প্রয়োজনে বিবদমান রাজ্যকে সাহায্য করত। এই রাজ্যগুলি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।[৩০৬] ঐতিহাসিক Clause Witz বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে রাজা মন্ত্রণাসভার সঙ্গে পরামর্শ করে শত্রুশিবিরে গুপ্তচর পাঠাতেন। কৌটিল্য শত্রু, মিত্র এবং উদাসীন রাজ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন বিজিগীষু রাজার গুপ্তচর প্রথমত শত্রু রাজ্যের প্রভাবশালী বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের বিভিন্ন কৌশলে স্বপক্ষে আনয়ন করবে। তারপর প্রজাসাধারণের মধ্যে চক্রান্ত দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ যুদ্ধের আগে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধশেষে গুপ্তচরদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মহাভারতে বলা হয়েছে যে শত্রুকে সর্বদাই শক্তিশালী ও বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা উচিত। প্রকাশ্যে শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে গোপনে তাকে ধ্বংস করতে হবে। কূটনীতিজ্ঞ কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, যুদ্ধের আগে রাজার উচিত সন্ন্যাসীর বেশে শত্রুরাজ্যে প্রবেশ করে শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তার আস্থা অর্জন করা। এমনকি শত্রুর মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন। এভাবে শত্রুর বিশ্বাস অর্জন করে তিনি নেকড়ের মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কচ্ছপের মতো নিজের দুর্বলতা গোপন করে শত্রুর দুর্বলতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে অতর্কিত আক্রমণে তাকে বিধ্বস্ত করতে হবে।[৩০৭] পরবর্তীকালে

শুক্র শত্রুর দুর্বল জায়গায় আক্রমণের পরামর্শ দেন।[৩০৮] অগ্নিপুরাণে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য গুপ্তচর ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৩০৯]

মহাকাব্যের যুগে সামরিক বিভাগে গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। মহাভারতে গুপ্তচরকে শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য আটটি অঙ্গের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা গুপ্তচরকে শত্রুর অবস্থা ও শক্তি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিতেন। এ ছাড়াও সৈন্যশিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী জমিখণ্ড চিহ্নিত করে গুপ্তচর রাজাকে জানাত। বিশ্বস্ত গুপ্তচর দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্দেশে নিয়মিতভাবে সততার সঙ্গে কর্তব্য পালন করত। চরকে 'বিবিধোপায়' আখ্যা দেওয়া হতো। কারণ শত্রু রাজ্যে প্রবেশকালে সে ছদ্মবেশ ধারণ করত। মহাভারতে রাজাকে অলক্ষ্যে শত্রুরাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুরাজ্যে অবস্থানকালে (রাজার) কুকুরের মতো সতর্ক, হরিণের মতো ত্রস্ত ও কাকের মতো ধূর্ত আচরণ করাই বিধেয়। এই মহাকাব্যে নারদ রাজাকে শত্রুর অষ্টাদশ তীর্থে চর প্রেরণ করে গুপ্ত খবর সংগ্রহ এবং মূল্যবান রত্নালংকার উপহার দিয়ে ঐ রাজ্যের বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের তুষ্ট করার পরামর্শ দেন।[৩১০] এসব বৃত্তান্ত প্রমাণ করে যুদ্ধে ন্যায় নীতির কোনো স্থান নেই।

যুদ্ধের আগে শত্রুরাজ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ভেদনীতি দ্বারা তার ধ্বংস সাধন করার জন্য গুপ্তচরদের ব্যবহার করা হতো। প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ (১ম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৮, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-৪৫) সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা এবং অধিকারের যুদ্ধ। যুদ্ধ ছিল, আছে, থাকবে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কালের ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অঙ্গুত্তরনিকায় থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ষোলোটি শক্তিশালী রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। এদের বলা হতো 'ষোড়শ মহাজনপদ'। কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি (বৃজি) মল্ল, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সূররেন, অস্মক, অবন্তি, গান্ধার এবং কম্বোজ নিয়ে গঠিত ছিল মহাজনপদ। জৈন-গ্রন্থ 'ভগবতী সূত্রে'র ষোড়শ মহাজনপদের তালিকা একটু ভিন্ন। এই তালিকায় রয়েছে গ্রন্থ, বঙ্গ, মগধ, মলয়, মালব, অচ্ছ, বৎস্য, কচ্ছ, রাঢ়, পাণ্ড্য, বজ্জী, মল্ল, কাশী, কোশল, অবাহ, সম্ভুত্তর। তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রদত্ত ষোড়শ মহাজনপদের তালিকা গ্রহণযোগ্য। জৈন 'ভগবতী সূত্র' প্রদত্ত তালিকা পরবর্তী কালের।[৩১১]

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বজ্জী রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মগধ এবং বজ্জী রাজ্যের সংঘাত লেগেই থাকত। এই সংঘাতের কারণ হিসেবে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। বুদ্ধ *চরিত* গ্রন্থ থেকে জানা যায় গঙ্গা তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধশালী বন্দরের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দুটি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে মগধরাজ অজাতশত্রু এবং তার অপর দুই ভ্রাতা হল্ল এবং বিহল্লের মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট দুষ্প্রাপ্য হাতি এবং মূল্যবান কণ্ঠহারের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়।

মগধরাজ অজাতশত্রু ভেদনীতি প্রয়োগ করে বজ্জীরাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত হন। বজ্জীরাজ চেতক ছিলেন অজাতশত্রুর পিতামহ। হল্ল, বিহল্ল মূল্যবান হাতি এবং রত্নালংকার নিয়ে চেতকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভেদনীতি দ্বারা বজ্জীরাজ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অজাতশত্রু বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভাস্করকে নিযুক্ত করেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জনসমক্ষে অজাতশত্রু বজ্জীরাজের নিন্দা করতে শুরু করলে ভাস্কর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই খবর শুনে বজ্জীরাজ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাস্করকে অমাত্যপদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। ভাস্কর সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় ভাস্কর তিন বছর বজ্জীরাজ্যে অবস্থান করে গোপনে ভেদনীতি দ্বারা বজ্জীদের ঐক্য বিনষ্ট করেন। ফলে ঐ রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়।[১২]

কৌটিল্যের মতে শত্রুর ঐক্য বিনষ্ট করার উপযুক্ত অস্ত্র ভেদনীতি। গুপ্তচরের প্রধান কাজ ভেদনীতি প্রয়োগ করে শত্রুর মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করবে। সুযোগ পেলে গুপ্তচর শত্রুকে হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। মনুর মতে, শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানের আগে গুপ্তচর মারফত সব খবর সংগ্রহ করে রাজা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে।[১৩] শত্রুর প্রতি বিক্ষুব্ধ রাজকর্মচারীদের স্বপক্ষে আনার জন্য গুপ্তচরদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করে যারা বিপক্ষ দলে যোগদান করে তাদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রাচীন ভারতে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদগণ যেভাবে শত্রুর ধ্বংসসাধনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কথা বলেছেন তার সাথে বর্তমানকালে অনুপ্রবেশকারীর মাধ্যমে শত্রুদেশে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের তুলনা করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে রাজনীতিতে যেভাবে ন্যায় নীতি বিসর্জন দেওয়া হতো আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। একবিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। রাষ্ট্রনীতিতে এসেছে গণতন্ত্র, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ। আজকের শ্লোগান একনায়কতন্ত্র নয়, সমানাধিকার। কিন্তু এটা নিছকই ভাবাদর্শ। আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ, নয়া সাম্রাজ্যবাদ (neo capitalism) এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের চেহারাটা অন্যরকম। বিশ্বের ধনী শক্তিশালী বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসন অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারেনি। মানবকল্যাণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করা হয়েছে তাতে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অভিনব উন্নতির ফলে ছোটোবড়ো প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আছে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র। অন্তর্ঘাত-মূলক কার্যকলাপ বেড়েছে। পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে বারুদের স্তূপের ওপর।

প্রাচীনকালে যুদ্ধের আগে গুপ্তচরদের কাজ ছিল যেমন জটিল তেমন বিপজ্জনক। শত্রুর অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চলের ওপর তাদের দৃষ্টি ছিল সজাগ। জীবন বিপন্ন করে

নিরাপত্তারক্ষীর দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের শত্রু-রাজ্যে প্রবেশ করতে হতো। প্রথমেই তারা ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাস্তাঘাটের মানচিত্র তৈরি করত। শত্রুর সৈন্যসংখ্যা, সামরিক ঘাটি, অস্ত্রাগার, অস্ত্রের পরিমাণ এবং গুণগত মানের সমস্ত তথ্য নিজেদের সামরিক দপ্তরে পাঠিয়ে দিত। এসব গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা অনেক সময় সাধু, সন্ন্যাসী, গণক ইত্যাদি সেজে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করত। শত্রুর রণকৌশল এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে শত্রুকে বিপাকে ফেলে ধ্বংস করাই ছিল গুপ্তচরদের উদ্দেশ্য।

রামায়ণ, মহাভারতে প্রাক্‌যুদ্ধ কালে গুপ্তচরদের করণীয় কাজের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ থেকে জানা যায় নির্বাসিত রাম, ভার্যা সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। এরপর তারা ক্রমশ এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটী নামক স্থানে উপস্থিত হলেন।[৩১৪] জায়গাটি অত্যন্ত মনোরম। সেখানে পর্ণকুটির বেঁধে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বাস করতে লাগলেন। একদিন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান সেরে তাদের কুটিরে পৌঁছে এক কুরূপা রমণীকে দেখতে পেলেন। ঐ রমণী নিজেকে রাবণের ভগ্নী শূর্পনখা পরিচয় দিয়ে রামকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল। তার নির্লজ্জ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। ক্রোধোন্মত্ত শূর্পনখা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভ্রাতা খর*-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খর সেনাপতি দূষণ অস্ত্রশস্ত্রে** সজ্জিত চোদ্দো হাজার সৈন্য নিয়ে রামের কুটিরে হাজির হলেন। দূষণ ভয়ংকর পরিখ নিয়ে (লৌহমুখ বা লৌহ কণ্টকময় মুদ্গর) রামকে আক্রমণ করেন। খর দূষণ তাদের চোদ্দো হাজার সৈন্য নিয়ে রামের হাতে নিহত হয়।

অকম্পন নামক খর দূষণের এক চর দ্রুতবেগে লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে এ সংবাদ জানাল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরামর্শ চাইতে রাবণ (খর)*** যোজিত উজ্জ্বল রথে চড়ে মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। রামের ভার্যা সীতাকে হরণ করে প্রতিশোধ নিতে তিনি মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মারীচ রাবণকে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। মারীচের কথা শুনে রাবণ লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

চোদ্দো হাজার রাক্ষস এবং খর দূষণ এবং ত্রিশিরা নামক পরাক্রমশালী রাক্ষসদের নিহত দেখে উদ্‌বিগ্ন শূর্পনখা লঙ্কায় রাবণের কাছে গেল। ইতিপূর্বে অকম্পনের কাছে সব কথা শুনেও মদমত্ত রাবণ নির্বিকার। সচিববেষ্টিত হয়ে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট রাবণকে দেখে শূর্পনখা প্রমাদ গুনলেন। সে তার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করায় মোহগ্রস্ত

---

* উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অষ্টম খণ্ডে আছে খর-শূর্পনখার মাসতুতো ভাই।

** অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল মুদ্গর-পট্টিশ (ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড ও বর্শা), খড়্গ ইত্যাদি।

*** অশ্বতর mule, কিংবা গর্দভ, গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখেছেন, পারস্যরাজ জারেক্সেস-এর বাহিনীতে যে ভারতীয় সৈন্য ছিল তারা বৃহৎ গর্দভযোজিত রথে যুদ্ধ করত।[৩১৫]

রাবণ বললেন, তিনি সুরগণের উৎপীড়ক, ধর্মের উচ্ছেদক এবং যজ্ঞের বিঘ্নকারী। ভোগবতী পুরীতে গিয়ে বাসুকিকে পরাজিত করে তিনি তক্ষকের ভার্যাকে অপহরণ করেছেন। কৈলাস পর্বতে গিয়ে কুবেরকে পরাজিত করে তিনি পুষ্পক রথ এনেছেন। ব্রহ্মার বরে তিনি অমর। তিনি ক্রূর, নির্দয়, কর্কশ, ত্রিলোক তার ভয়ে কম্পিত। এসব কথা শুনে সক্রোধে শূর্পনখা রাবণকে বলল,

> তুমি কামভোগে প্রমত্ত, স্বেচ্ছাচারী, নিরঙ্কুশ, তোমার বোঝা উচিত যে আমার ভয় উপস্থিত হয়েছে, তথাপি তুমি বুঝছ না। রাক্ষস তুমি বালস্বভাব, বুদ্ধিহীন। যা জ্ঞাতব্য তা জানো না কি করে রাজত্ব করবে? তোমার চর ব্যবস্থা দুর্বল, সচিবরাও মূর্খ। তাই জানোনা যে তোমার স্বজন এবং তাদের বাসস্থান ধ্বংস হয়েছে...

শূর্পনখার খেদোক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও বৈভব রাবণের গুপ্তচর ব্যবস্থা দুর্বল করে দিয়েছিল। এই দুর্বল গুপ্তচর ব্যবস্থা (অনুক্তাচারম) যে রাবণের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে শূর্পনখার এ আশঙ্কা পদে পদে প্রমাণিত হয়।[৩১৬]

রামের গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল সুদক্ষ, হনুমান ছাড়া রামের অন্যান্য বিশ্বস্ত চরের নাম অনল, পানিশ, সম্পাতি এবং প্রমতি। এছাড়া রাবণের সহোদর বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করায় রাম শত্রুর অনেক খবর সংগ্রহ করেন। বিভীষণের সহায়তায় এবং ছদ্মবেশী চরদের মাধ্যমে রাম রাবণের সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র, রথ, হস্তী ও অশ্ববাহিনীর সঠিক খবর জানতে পারেন।

সীতা হরণের পর রাম, লক্ষ্মণ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে পম্পা সরোবরের তটে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে তারা ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে পৌঁছলেন। ধার্মিক বানরপতি সুগ্রিব তার ভ্রাতা বালী কর্তৃক রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সেখানে পরিভ্রমণ করছিলেন। তিনি অস্ত্রধারী রাম লক্ষ্মণকে দেখে তাদের বালীর চর ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তার অবস্থা দেখে সুবক্তা হনুমান সুগ্রীবকে বললেন,

> বানর শ্রেষ্ঠ, ভয় ত্যাগ কর, এই মলয় পর্বতে[৩১৭] বালী হতে কোনও ভয় নেই। তুমি যার ভয়ে পালিয়ে এসেছ সেই ক্রূরদর্শন বালীকে আমি এখানে দেখছি না। তুমি তোমার বানরস্বভাব প্রকাশ করছ, লঘুচিত্ততার জন্য অস্থির হয়ে আছ। বুদ্ধি প্রয়োগ কর, ইঙ্গিত থেকে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে কাজ কর। বুদ্ধিহীন রাজা প্রজাশাসন করতে পারে না।[৩১৮]

ধূর্তবুদ্ধি সম্পন্ন হনুমান ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে রাম, লক্ষ্মণের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের পরিচয় জেনে নিলেন। হনুমানের সহায়তায় রাম, লক্ষ্মণের সাথে সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হয়। সুগ্রীবের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল। তার কাছেই রাম সীতার অবস্থানের কথা জানতে পেরে হনুমানকে তার সন্ধানে

নিযুক্ত করেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে হনুমান শেষ পর্যন্ত ত্রিকূট পর্বতের ওপর অবস্থিত লঙ্কায় এসে উপস্থিত হলেন। পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত লঙ্কা অত্যন্ত রমণীয়। লঙ্কার গগনস্পর্শী উত্তরদ্বারে উপস্থিত হয়ে হনুমান চিন্তা করলেন এ দুর্গম সুরক্ষিত লঙ্কা জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। রাম এখানে এসে কী করবেন ? যাই হোক বৈদেহী জীবিত আছেন কিনা জেনে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করার কথা ভাবলেন হনুমান!

সন্ধ্যাকালে হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে তার জাঁকজমক দেখে বিস্মিত হন। লঙ্কার দ্বার সমূহ স্বর্ণময়, সোপান বৈদূর্য খচিত, সর্বস্থান দীপালোক ও জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ। দু'পাশে মনোরম অট্টালিকা। কোথাও মধুর সংগীত, কোথাও ভূষণের নিক্কণ, কোথাও সিংহনাদ এবং কোথাও বেদপাঠ হচ্ছে। একটি গৃহে রয়েছে অনেক গুপ্তচর। তাদের মধ্যে কেউ জটাধারী, কেউ মুণ্ডিত মুস্তক। বর্মধারী রাক্ষসরা বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে প্রহরায় রত। দ্বারদেশে অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করছে, সজ্জিত রয়েছে রথ, বিমান ও চতুর্দন্ত শ্বেতহস্তী।

ঘুরতে ঘুরতে হনুমান রাবণের ভবনে উপস্থিত হন। ভবনের প্রাকারের রং উজ্জ্বল লাল, জায়গায় জায়গায় রৌপ্য নির্মিত স্বর্ণখচিত তোরণদ্বার এবং সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। সেখানে রয়েছে গজারোহী মাহুত, বেগবান অশ্ব ও রথসহ সারথি, অক্লান্ত কর্মী বীর এবং সালংকারা বরনারী। সর্বত্র বাজছে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ। রাজধানী লঙ্কা প্রদক্ষিণ করার সময় হনুমান একে একে প্রহস্থ, মহাপার্শ্ব, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ধূম্রাক্ষ, বীরুপাক্ষ, শুক, সারণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাসাদ অতিক্রম করে গভীর রাতে লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন আকারের শিবিকা এবং লতাগুল্ম শোভিত গৃহ, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, কামগৃহ, দিবাগৃহ এবং ধনশালা। এরপর হনুমান দেখলেন সর্বোৎকৃষ্ট উন্নত, কাঞ্চন ভূষিত মনোহর একটি গৃহ। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে এটি রাক্ষসাধিপতি রাবণের গৃহ। এরপর তার নজরে এল বহুরত্নভূষিত স্বর্ণগবাক্ষযুক্ত পুষ্পক রথ। এই রথ বায়ুপথে সূর্যের গতিমার্গ পর্যন্ত উড়তে পারে।

এক যোজন দীর্ঘ, অর্ধযোজন বিস্তৃত অত্যাশ্চর্য বাসগৃহটি দেখে হনুমান তাকে রাবণের প্রাসাদ বলে অনুমান করলেন। চতুর্দন্ত ও ত্রিদন্ত হস্তী সেখানে বিনা বাধায় বিচরণ করছে। তাদের প্রহরায় রয়েছে অস্ত্রধারী রক্ষক। একটি গৃহে রয়েছে রাবণের অজস্র রাক্ষসী উপপত্নী এবং বলপ্রয়োগে সংগৃহীত রাজকন্যারা। হনুমান এবার রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে কাঞ্চন স্তম্ভের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। বিচিত্র আস্তরণের ওপর মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত অজস্র পানমত্ত বরনারী নিদ্রিতা। তাদের স্খলিত বসন। ঐ গৃহে রয়েছে একটি স্ফটিকের বেদী। তার ওপর হস্তীদন্ত ও কাঞ্চন নির্মিত বৈদূর্য দূষিত একটি পর্যঙ্ক স্থাপিত। এই পর্যঙ্কে মহার্ঘ আস্তরণের ওপর নিদ্রামগ্ন রয়েছেন সুরূপ কামরূপী রাবণ। একটি পৃথক শয্যায় ঘুমিয়ে রয়েছেন রাবণের প্রিয় মহিষী মন্দোদরী। তার রূপে শয়নগৃহ আলোকিত। তাকে দেখে হনুমানের ভ্রম হল ইনিই সীতা। পরক্ষণেই হনুমান ভাবলেন রাম বিরহিনী সীতা এভাবে মত্ত হয়ে শুয়ে

থাকতে পারেন না। হনুমান রাবণের পানশালায় ঢুকে দেখলেন রূপলাবণ্যবতী সুভূষিতা বরনারী নৃত্য গীত, রতিক্রীড়ায় ক্লান্ত এবং মদ্যপানে বিহ্বল হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এভাবে পরস্ত্রী দেখে সাত্ত্বিক হনুমান ধর্মচ্যুত হবার ভয়ে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করলেন। তিনি স্থির করলেন সীতাকে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তার অন্বেষণ করবেন।

এরপর হনুমান একটি বৃহৎ অশোকবন দেখে সেখানে প্রবেশ করলেন। অশোক কাননের শোভা তাকে মুগ্ধ করল। কিছু দূরে রয়েছে একটি কাঞ্চন বর্ণ শিশু গাছ, তার নীচে সুবর্ণ বেদী। গাছের আড়াল থেকে হনুমান লক্ষ করলেন ঐ বৃক্ষমূলে কুরূপা হিংস্র নারী প্রহরী বেষ্টিতা হয়ে বসে আছেন এক রমণী। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা ঐ রমণী কৃশ, অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং তার পরনে একটি মাত্র পীত বসন। কিন্তু তিনি জ্যোতির্ময়ী, অতি পবিত্র তার রূপ। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই সীতা, কারণ রাম যে সব ভূষণের কথা বলছিলেন তা এর অঙ্গে রয়েছে। অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন তা তার অঙ্গে নেই। স্বভাব, বয়স ও আভিজাত্যে এই কনকবর্ণা রমণী রামের একমাত্র যোগ্যা। ত্রিভুবনে আর কোনো রমণীর সঙ্গে সীতার অংশমাত্রেরও তুলনা হয় না। ইনিই সাক্ষাৎ দেবী। হনুমানের নয়ন হল অশ্রুসিক্ত।

প্রচ্ছন্ন থেকে হনুমান সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। রাত্রিশেষে রাবণ সীতাকে দেখার লোভে অশোক কাননে উপস্থিত হলেন, তার সঙ্গে স্বর্ণপ্রদীপ, তালবৃন্ত (পাখা), স্বর্ণভৃঙ্গার, গোলাকার আসন, সুরাপানের পাত্র, রাজচ্ছত্র প্রভৃতি নিয়ে অনেক নারী গেল। রাবণের ভার্যারাও তাকে অনুসরণ করলেন। সীতা সকাশে উপস্থিত হয়ে রাবণ নানা চাটুবাক্যে জানকীর মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সীতাকে প্রস্তাব দিলেন তাকে গ্রহণ করতে। ঘৃণায় তার সমস্ত কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন জানকী।

রাবণ চলে যাওয়ার পর রাক্ষসীরা একটু অসতর্ক হতেই হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সীতার সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম করে জানতে চাইলেন, ইনিই সীতা কিনা। সীতার সন্দেহ হল এ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কোনো নিশাচর কিনা। হনুমান তাকে আশ্বস্ত করে জানালেন তিনি মায়াবী রাক্ষস নয়, রামের দূত। রামের রূপ গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করে সীতাহরণের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা হনুমান বিবৃত করলেন। সীতার প্রত্যয়ের জন্য হনুমান তাকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন।

রামের অঙ্গুরীয় নিয়ে সীতার মুখ রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তার বস্ত্র থেকে একটি দিব্য চূড়ামণি (তিলক-টীকাকার বলেন, সীতার বিবাহকালে তার জননীর কাছ থেকে নিয়ে জনক এই মণি দশরথের হাতে দিয়েছিলেন) বার করে দিয়ে বললেন, রাঘব এই অভিজ্ঞান চেনেন। এটি দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন হনুমান সীতার কাছে এসেছিলেন। এরপর সীতার বার্তা নিয়ে হনুমান রামের কাছে ফিরে যান।*

* The dialogue between Sita and Hanumana and the revelation of his identity as Rama's agent and the system of communication of messages represent a version of the standard espionage scenario that mostly took place before outbreak of war in India between contending powers.[৩১৯]

অদম্য সাহস ছাড়াও হনুমান ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দুর্লভ প্রজ্ঞার অধিকারী। গুপ্তচর ও দূতের সমস্ত গুণাবলী ছিল তার মধ্যে। লঙ্কা পরিভ্রমণকালে হনুমান উপলব্ধি করেন শক্তি ও অপরিমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারী রাক্ষসরা আপোষহীন ও অহঙ্কারী। শত্রুপক্ষের বলাবল নির্ণয়ের জন্য সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায় বর্জন করে দণ্ডনীতি অবলম্বন করতে হবে:

ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে
ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে।
ন ভেদসাধ্যা বলদর্পিতা জনাঃ
পরাক্রমস্ত্বে মমেহ রোচতে॥

(৪১/৩,. *বাল্মীকি রামায়ণ*, সুন্দরকাণ্ড)

রাক্ষসদের প্রতি সাম (সন্ধি বা তোষণ) নীতি ফলপ্রসূ হবে না, দানও যুক্তিসংগত নয় কারণ তারা সমৃদ্ধ। বলদর্পিত জনের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। একমাত্র দণ্ডনীতি (যুদ্ধ) দ্বারা এদের ধ্বংস করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। হনুমান শত্রুর শক্তি পরখ করার জন্য দণ্ডনীতি বেছে নিলেন। অশোক কাননের বৃক্ষগুলি ধ্বংস করতে লাগলেন হনুমান। কুপিত রাবণ হনুমানকে ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র সৈন্য পাঠালেন তাতে রাবণের সামরিক শক্তি সম্পর্কে হনুমানের ধারণা হল। যুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য শত্রুর সামরিক ঘাটি, সৈন্যসংখ্যা, দুর্গ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অস্ত্রাগার, অস্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকার দরকার। বুদ্ধি ও সাহস ছাড়াও হনুমানের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অসাধারণ। সুগ্রীবকে হনুমান প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় লঙ্কা অত্যন্ত সুরক্ষিত। নগরের সমস্ত প্রবেশদ্বারে রয়েছে সতর্ক প্রহরী। চারটি প্রবেশদ্বারেই লোষ্ট্রনিপেক্ষক যন্ত্র রয়েছে।* দুর্ভেদ্য পর্বতমালার ওপর লঙ্কার অবস্থান। সুউচ্চ প্রাচীর ও গভীর পরিখা দিয়ে ঘেরা লঙ্কা। পরিখার জলে বিচরণ করছে অসংখ্য নরখাদক কুমির। নগরে প্রবেশের জন্য পরিখার উপর রয়েছে বেশ কয়েকটি মজবুত সেতু। সর্ববৃহৎ সেতুটি দেখার মতো। অনেকগুলি স্বর্ণস্তম্ভের ওপর এই সেতুর অবস্থান। নগরে প্রবেশের পথে প্রচুর শতঘ্নী (iron missiles) মজুত করে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রবেশ পথেই শতঘ্নী নিক্ষেপ করে শত্রু নিধন করা যায়। অপরিচিত ব্যক্তি সেতুপথে নগরে প্রবেশের চেষ্টা করলে লোষ্ট্রনিক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে তাকে পরিখার জলে ফেলে দেওয়া হয়। সমুদ্র থেকে রাজধানী বেশ দূরে। নৌযানে সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব। রাবণের বিপুল সৈন্য, হস্তী ও অশ্ববাহিনী দেখে হনুমান বিস্মিত হন। স্বয়ং রাবণ নগরের সর্বত্র নিয়মিত পরিদর্শন করেন। চতুর্বর্গ

---

* এ প্রসঙ্গে ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আরব মুসলমান কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়। আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধুরাজ দাহিরকে আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন। ঐ সময় কাশেম 'বলিস্ত' নামক লোষ্ট্রনিক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে দেবল বন্দর নিশ্চিহ্ন করে দেন।

পল্টন নিয়ে অস্ত্রধারী রাক্ষসরা দিবারাত্রি প্রহরায় রত। নগরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিপুল অশ্ববাহিনী। লঙ্কাধিপতি রাবণের শক্তি নিরূপণের জন্য যে সব খবর সংগ্রহ করেন তাতে তার অসামান্য বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রতিফলিত হয়। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তার ব্যক্তিগত চর ছিল অনল, পানস, সম্পাতি এবং প্রমতি। এরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে লঙ্কায় প্রবেশ করে জানতে পারে যে প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ যথাক্রমে লঙ্কার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বহন করেছেন। বীরুপাক্ষ নামে রাজপুরুষ রাবণের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল রক্ষার ভারপ্রাপ্ত। বিভীষণের গুপ্তচর দল রাবণের হস্তী, অশ্ব, যুদ্ধরথ ও সৈন্যের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করে।[২০]

চরম রাজনৈতিক সংকটে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব গুপ্তচরদের সহায়তায় কীভাবে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত 'জতুগৃহদাহ' ঘটনায় তা জানা যায়। পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য দুর্যোধন মাতুল শকুনি ও কর্ণের সঙ্গে গোপনে মন্ত্রণা করে তাদের কুন্তীসহ বারণাবতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝলেও নিজের অসহায় অবস্থার কথা বুঝে বারণাবতে যেতে রাজি হন।

হৃষ্ট দুর্যোধন গোপনে বিশ্বস্ত মন্ত্রী পুরোচনকে শন, সর্জরস (ধুনা) গালা এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দিয়ে পাণ্ডবদের জন্য একটি সুসজ্জিত গৃহ নির্মাণের আদেশ দিয়ে বারণাবতে পাঠালেন। পুরোচন দ্রুতগামী রথে চড়ে বারণাবতে পৌঁছলেন। ব্যবস্থা হল কিছুদিন পরে গভীর রাতে পাণ্ডবরা যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে তাদের পুড়িয়ে মারতে হবে।

বুদ্ধিমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গি দেখে তার দুষ্ট অভিসন্ধি সহজেই বুঝে নেন। বিদুর ছিলেন ধার্মিক ও যুধিষ্ঠিরের বন্ধু। বিদুর ও যুধিষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছ ভাষা জানতেন।* যুধিষ্ঠিরের যাত্রাকালে বিদুর অন্যের দুর্বোধ্য ম্লেচ্ছভাষায় তাকে বললেন, শত্রুর অভিসন্ধি যে জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ত্রেও প্রাণনাশ হয়। অগ্নিতে শুষ্ক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হানি হয় না। মানুষ সজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা দিকনির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে বাঁচাতে পারে। যুধিষ্ঠির বিদুরের ইঙ্গিত বুঝে ফেললেন।

পাণ্ডবরা মাতা কুন্তীসহ বারণাবতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারা জয়ধ্বনি করে উঠল। পুরোতন মহাসমারোহে তাদের জতুগৃহে নিয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির সেখানে পৌঁছে ঘৃত,

---

* এই ম্লেচ্ছভাষা সম্ভবত রোমান ভাষা। সুপ্রাচীন কাল থেকে রোমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। মহাভারতে রোমকদের উল্লেখ আছে। রোমক অর্থাৎ রোমান। (মহাভারত, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, অনুবাদ P. C. Roy, (trans), p. 65/মহাভারত, (আদিপর্ব), রাজশেখর বসু, p. 65, Ibid, p. 63-64)

তৈল, লাক্ষা ইত্যাদির গন্ধ পেয়ে ভীমকে পুরোচনের অভিসন্ধির কথা জানালেন। ভীম তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির জানালেন, সর্বত্র রয়েছে দুর্যোধনের চরেরা। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ঐ চরদের হাতে তাদের মৃত্যু ঘটবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তারা মৃগয়ার ছলে সর্বত্র ঘুরে পথঘাট চিনে নেবেন। জতুগৃহের ভূমিতে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তারা সেখানে থাকবেন।

এরই মধ্যে একদিন বিদুরের চর নির্জনে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তিনি বিদুর কর্তৃক প্রেরিত। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাতে পুরোচন এই গৃহে আগুন দেবে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পুরোচন এই গৃহের চারদিকে প্রচুর অস্ত্র রেখেছে। তাই পাণ্ডবরা কোনোমতেই পালিয়ে যেতে পারবেন না। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে বিদুরের চর জতুগৃহ থেকে পলায়নের জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করলেন। পুরোচন ঐ গৃহের দ্বারদেশে অবস্থান করত। সেইজন্য সুড়ঙ্গের পথ আবৃত করা হল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে আর এক বনে মৃগয়া করতে বেরোতেন এবং রাতে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে সুড়ঙ্গ-পথে রাত কাটাতেন।

এভাবে এক বছর কেটে গেল। পুরোচন ভাবল পাণ্ডবদের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। এক রাতে জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করে পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তীসহ সুড়ঙ্গপথে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হলেন। পুরোচন সহ আরও পাঁচজন জতুগৃহে নিদ্রিত ছিল। তারা সবাই পুড়ে মরল। বিদুরের চরেরা অস্ত্রসজ্জিত, বায়ুবেগসহ যন্ত্রযুক্ত একটি নৌকায় দ্রুতগতিতে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়। এই উন্নত মানের জলযানটির বাতাস ও ঢেউয়ের ধাক্কায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।[২২১] পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে কর্ণ, দুর্যোধন এবং দুঃশাসন তাদের অনুসন্ধানে স্বদেশ, প্রতিবেশী রাজ্য, পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল, রঙ্গশালা, তীর্থস্থান, গুহাকন্দর, সাধুদের আখড়া অর্থাৎ সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় চর পাঠিয়েছিলেন। গুরু দ্রোণাচার্য সেই সময় বললেন, পাণ্ডবরা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সৎ এবং সুচতুর। তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। বাস্তবেই কৌরবদের প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। পাণ্ডবদের কোনো হদিশই পাওয়া গেল না।

পাণ্ডবশিবিরে যোগদান করেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ। প্রজ্ঞাবান কৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর মতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শত্রু-মিত্র উভয় রাজ্যের গোপন খবর সংগ্রহের জন্য চরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনেকটাই চরের ওপর নির্ভর করে। কৌরব শিবিরে শ্রীকৃষ্ণ চর পাঠিয়ে তাদের সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ প্রস্তুতির অনেক খবর সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, চরের প্রধান কাজ শত্রু রাজ্যে বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল করে দেওয়া। কার্য উদ্ধারের জন্য একজন চরকে হতে হবে কুকুরের মতো ত্রস্ত, হরিণের মতো ক্ষিপ্র এবং বায়সের মতো ধূর্ত। দৃশ্যত শত্রুর প্রতি তার আচরণ হবে মধুর, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক।[২২২] পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে কৌটিল্য (চাণক্য) সহ অন্যান্য বিদগ্ধ রাজনীতিবিদগণ এই একই মতের প্রতিধ্বনি করেছেন।

শুধু মহাকাব্য নয়, *বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর* এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে সামরিক বিভাগে গুপ্তচর ব্যবহারের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[২৩]

মহাউন্মার্গ জাতক থেকে জানা যায়, প্রাচীন মিথিলা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বিদেহ। রাজ্যশাসনে তিনি প্রাজ্ঞ মহাসত্ত্বর মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। মহাসত্ত্ব প্রতিবেশী রাজ্যগুলির খবর সংগ্রহের জন্য চর নিযুক্ত করেন। প্রাচীনকালে গুপ্তচর দপ্তরে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুপাখির ব্যবহারের কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। মহাসত্ত্ব বিভিন্ন রাজ্যের আরও গোপন খবর জানার জন্য একটি শুকপাখিকে পাঠালেন। শুক-এর মাধ্যমে মহাসত্ত্ব জানতে পারলেন উত্তর পাঞ্চালের রাজা চুরানী ব্রহ্মদত্ত তার প্রধান অমাত্য কৈবর্তের পরামর্শে সমগ্র জম্বুদ্বীপ অধিকারের পরিকল্পনা করেছে। মিথিলা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজ্য তার পদানত হয়েছে। ব্রহ্মদত্ত ও কৈবর্ত পরাজিত রাজাদের বিষাক্ত পানীয় দিয়ে হত্যা করে মিথিলা আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মহাসত্ত্বর চরেরা অত্যন্ত তৎপরতায় এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।[২৪]

এসব কাহিনি কিছুটা কাল্পনিক বা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এসবের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। এরকম গল্পচ্ছলে সামরিক কার্যকলাপ ও কৌশল সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তার অনেকটাই সর্বাধুনিক সামরিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যুদ্ধে পায়রার ব্যবহার, অপরাধী শনাক্তকরণে কুকুরের ব্যবহার আজও অব্যাহত।

বিশ্বস্ত গুপ্তচর যুদ্ধকালে শত্রুশিবিরের সামরিক কৌশলের নানা খবর সংগ্রহ করে অনেক সময় দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করত। বৎসরাজ উদয়ন এবং বারাণসীর রাজা ছিলেন একে অপরের শত্রু। উদয়ন বারাণসী আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন সৌগন্ধরায়ণ ছিলেন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও কৌশলী। অতীতে সৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত চরের সাহায্যে বৎসরাজ প্রেমিকা বাসবদত্তাকে হরণ করেছিলেন। যাই হোক, যুদ্ধের আগে সৌগন্ধরায়ণ সাধুর ভেকধারী একদল গুপ্তচর বারাণসী সীমান্তে পাঠালেন। এদের মধ্যে একজন গুরু সেজে বসল। ভেকধারী শিষ্যরা ঐ সিদ্ধ সাধকের অলৌকিক ক্ষমতার কথা সর্বত্র প্রচার করতে লাগল। তাতে অজস্র লোকের সমাগম হল। এদের মধ্যে ছিলেন বারাণসীর যুবরাজ। তার কাছ থেকে ঐ গুরুবেশী চর বারাণসী রাজের রণকৌশল-এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করল। বারাণসীর মন্ত্রী যোগকরন্দ বৎস সৈন্য শিবিরের চারপাশে, রাস্তার দুধারের জলাশয়, গাছ, লতাপাতায় বিষ ছড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেয়। এ ছাড়াও সুন্দরী, লাস্যময়ী বারবনিতা, নর্তকী, বিষকন্যা এবং গুপ্তঘাতক রাখা হয়।[২৫]

যুদ্ধে এ ধরনের নীতি-বিগর্হিত কার্যকলাপ চিরকালীন। আধুনিক যুগে উন্নত ভয়াবহ মারণাস্ত্র ছাড়াও ব্যবহার করা হয় বিষাক্ত গ্যাস ও রোগ জীবাণু। নারী গুপ্তচর নিয়োগ কোনো নতুন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে অসাধারণ রূপসী, লাস্যময়ী নৃত্যপটিয়সী মাতাহারির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নারী গুপ্তচরদের মধ্যে তাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বলা যেতে

পারে। হল্যান্ডের এক অভিজাত পরিবারে ১৮৭৬ সালে মাতাহারির জন্ম। তার সংক্ষিপ্ত নাম মার্গারেটা। হল্যান্ডে এক মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্বামী ম্যাকলিওড মার্গারেটাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে মার্গারেটা মাতাহারি (eyes of the morning) নামে অসাধারণ এক নৃত্যশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অচিরেই তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় বার্লিনের পুলিশপ্রধান Trauffant Van Jagow এক নৈশ ক্লাবে মাতাহারির প্রেমে পড়েন। তিনি মাতাহারির খ্যাতি নিজের এবং জার্মানির স্বার্থে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে Jagow মাতাহারিকে জার্মান গুপ্তচর সংস্থায় নিযুক্ত করলেন। মাতাহারি হলেন জার্মান এজেন্ট H. 21. নৈশ ক্লাবে ফ্রান্সের বহু বিত্তবান এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন মাতাহারি। এসব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে অনেক গোপন তথ্য আদায় করে মাতাহারি Jagow-কে জানাতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের ভিত্তেল গ্রামে মাতাহারি আহত ফরাসি মিলিটারি অফিসারদের নার্স হিসেবে নিযুক্ত হন। এদের কাছে তিনি ফরাসিদের জার্মানি আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে এ খবরটি মাতাহারি জার্মান শিবিরে পাঠিয়ে দেন। জার্মানির অতর্কিত আক্রমণে এক লক্ষ ফরাসি সৈন্য নিহত হয়। অনেকের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাতাহারি জার্মানি ও ফ্রান্স উভয় দেশের double agent হয়ে কাজ করতেন। ১৯১৭ সালে মাতাহারি প্রতারণার দায়ে ফরাসি সরকারের হাতে ধরা পড়েন। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের আর এক উল্লেখযোগ্য নারী গুপ্তচর ছিলেন নূর এনায়েৎ খান, ওরফে ম্যাডেলান। তিনি ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ব্রিটেনে নূর-এর জন্ম। কিন্তু তিনি ফ্রান্সে প্রতিপালিত হন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স নাৎসি জার্মানির দখলে চলে যায়। নূর খান পরিবারের সঙ্গে ব্রিটেনে পালিয়ে যান। সুফি আদর্শে বিশ্বাসী হলেও নূর জার্মানির সাথে লড়াইয়ের পথ বেছে নেন। ব্রিটেনে সামরিক শিক্ষা লাভ করে তিনি মিত্রপক্ষে ব্রিটেনের নারীবাহিনীতে যোগ দেন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে নূর-এর নেতৃত্বে এক গুপ্তচর বাহিনী ফ্রান্সে পাঠানো হয়। তার সঙ্গীরা ধরা পড়ে। তিন মাস কর্তব্যে অটল থেকে নূর-জার্মানির নাৎসি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। দশ মাস অকথ্য অত্যাচার করেও তার কাছ থেকে ব্রিটেনের কোনো গোপন কথা ফাঁস করা যায়নি। এরপর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নূরকে বলা হয় স্পাই প্রিন্সেস। ফ্রান্স ও ব্রিটেনে তিনি মরণোত্তর সম্মান পান।

বৈদেশিক আক্রমণে ভারতে গুপ্তচরের ভূমিকা

খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ ক্রমাগত বিদেশি আক্রমণের সম্মুখীন হতে থাকে। ভারতে অনুপ্রবেশের আগে বিদেশি আক্রমণকারীরা গুপ্তরচর মারফৎ এদেশে প্রবেশের পথ, অভ্যন্তরীণ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থার সব খবর সংগ্রহ করে।

'The whole region was at once wealthy and disunited and formed the natural prey of the strong. Achaemanian monarchy which grew up in Persia...'

খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে পারস্য রাজ সাইরাস ভারত সীমান্তে উপস্থিত হন। ৩২৭ খ্রি. পূ. জেনোফোনের বিবরণ থেকে জানা যায় ভারত আক্রমণের আগে সাইরাস উত্তর ভারতের সীমান্তবর্তী কোনো এক রাজ্যের রাজার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ঐ রাজা সাইরাসকে প্রচুর ধনরত্ন দেন এবং তার ভারত অভিযানে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩২৬]

সাইরাসের পুত্র দারায়ুস (Darius) খ্রি. পূ. ৫১৭-তে ভারত আক্রমণ করেন। ভারত অভিযানের আগে ভারতে প্রবেশের জলপথ আবিষ্কারের জন্য তিনি স্কাইলাক্সের নেতৃত্বে নাবিক পাঠিয়েছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে দারায়ুসের সিন্ধু ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আক্রমণের পথ সুগম হয়। দারায়ুস চর মারফৎ জানতে পারেন গাঙ্গেয় উপত্যকায় মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি রাজ্য শক্তিশালী, সুরক্ষিত এবং তাদের গুপ্তচর ব্যবস্থা খুবই সুদক্ষ। অতএব দারায়ুস গাঙ্গেয় উপত্যকা অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলেও সম্রাট Xerexes-এর আমল পর্যন্ত ভারত সীমান্তের বেশ কিছু জায়গায় পারসিক প্রাধান্য বজায় ছিল।

খ্রি. পূ. চতুর্থ শতক থেকে ভারতের পাঞ্জাব এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে গ্রিক ভ্রমণকারী ও বণিকদের যাতায়াত ছিল। তাদের ভারত বিবরণ এবং খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে পারস্যের রাজসভায় অবস্থিত গ্রিক দূত টেসিয়াসের লেখা ইন্ডিকা থেকে ম্যাসিডোনিয়ান আলেকজান্ডার ভারত সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেন। ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসন লাভ করে আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ে বেরোলেন। ৩৩৫ খ্রি. পূ. সিংহাসনারোহণ কালে আলেকজান্ডারের বয়স ছিল কুড়ি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, অসামান্য ছিল তার সামরিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা। দু বছরের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পদানত করে তিনি পারস্য জয়ে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া তার দখলে এসেছে। ৩৩১ খ্রি. পূ. আরবেলার যুদ্ধে পারসিক রাজ দ্বিতীয় দারায়ুসকে পরাজিত ও নিহত করে রাজধানী পার্সিপোলিস দখল করেন। এই সময় তিনি আলেকজান্দ্রিয়া (সম্ভবত বর্তমান কান্দাহার) নগরটির পত্তন করেন। আফগানিস্তান আলেকজান্ডারের দখলে আসে। এর পর তার ভারত (country of milk and honey) অভিযানের পালা। ভারত আক্রমণের আগে সমগ্র পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে চর পাঠালেন। চর মারফৎ আলেকজান্ডার জানতে পারলেন ঐ সব রাজ্যের রাজারা একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত। আলেকজান্ডারের আসার খবর পেয়ে অনেকেই আত্মসমর্পণ করলেন। শুধু তাই নয়, এদের মধ্যে অনেকেই আলেকজান্ডারের বিশ্বস্ত চর হয়ে উঠলেন এবং একে অপরের সমস্ত গোপন খবর তার কর্ণগোচর করতে লাগলেন। আলেকজান্ডার দেখলেন ভারত আক্রমণের এটাই সুবর্ণ সুযোগ। ভারত সীমান্তে উপস্থিত হয়ে আলেকজান্ডার তক্ষশীলার

রাজা অম্ভির সহায়তা লাভ করেন। প্রতিবেশী শক্তিশালী রাজা পুরুর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অম্ভি আলেকজান্ডারের কাছে প্রচুর মূল্যবান উপহার ও শান্তিপ্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভবত অম্বিই প্রথম দেশদ্রোহীর এক জঘন্য দৃষ্টান্ত। তিনি কাবুল হয়ে সিন্ধুদেশে প্রবেশের রাস্তা আলেকজান্ডারকে দেখিয়ে দিলেন। ভারত সীমান্তবর্তী রাজ্যে নেমে এল ঘোর দুর্দিন ও বিপর্যয়। সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গ্রিক সৈন্য প্রথমেই কাবুল নদীর উত্তরে অবস্থিত পুষ্কলাবতী নগরটি আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। ঐ রাজ্যের রাজা পার্শ্ববর্তী প্রাচীর বেষ্টিত একটি নগরে আশ্রয় নেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রিক সৈন্যদের হাতে ধরা পরে তিনি নিহত হন। আলেকজান্ডার ঐ রাজ্যটি সঞ্জয় নামে (a hanger on the Raja of Taxila) এক বিশ্বাসঘাতককের হাতে অর্পণ করেন।[২২৭]

একে একে অশ্মক, আয়ুধ, জীবিক, কটক, ক্ষুদ্রক এবং মলয় নামক পার্বত্য রাজ্যগুলির শাসককুল অম্ভিকে অনুসরণ করে গ্রিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হিন্দুকুশ অঞ্চলের আর একটি রাজ্যের রাজা শশীগুপ্ত গ্রিকদের ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দেন।

সীমান্তের অপর একটি রাজ্য মাসাগা গ্রিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মাসাগার রাজা যুদ্ধের জন্য পাঞ্জাব থেকে ভাড়াটে সৈন্য আমদানি করেন। কিন্তু সমূহ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখে ভীত হয়ে ঐ সৈন্যদল গ্রিকদলে যোগ দেয়। পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফিরে আসার চেষ্টা করলে গ্রিকরা চর মারফৎ খবরটি জেনে যায়। নৃশংসভাবে তারা ঐ সৈন্যদের হত্যা করে।[২২৮] সিন্ধুর নিকটবর্তী আর একটি স্থান আওরনস। আলেকজান্ডার স্থানীয় চরদের কাছে খবর পান প্রধান নগরদুর্গের প্রহরীরা দুর্গ পরিত্যাগ করে অভিসার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অভিসার রাজ গ্রিকদের অগ্রগতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। পুরুর সঙ্গে আলেকজান্ডারের হিদাস্পিসের যুদ্ধের আগে অভিসাররাজ উভয়ের চর (double agent) হিসাবে কাজ করেন। পুরুকে যুদ্ধে সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আলেকজান্ডারকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

পুরু নিঃসন্দেহে বীর, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা রাজা ছিলেন। কিন্তু তার গুপ্তচর ব্যবস্থা ও যুদ্ধকৌশল আলেকজান্ডারের মতো দক্ষ ও উন্নত ছিল না। আলেকজান্ডার বিরল সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পুরুর সদাজাগ্রত চর ও সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে সিন্ধুনদের উপর গ্রিকরা একটি নৌকার সেতু নির্মাণ করে পুরুকে অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত করে দেয়। অলক্ষে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খনন করে গ্রিকরা সমরস্ রাজ্যের রাজধানী সিন্ডিমনের সুরক্ষিত দুর্গম দুর্গটি দখল করে নেয়। আলেকজান্ডার যখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পঞ্চনদীর তীরে অবস্থান করছেন তখন ভারতীয় রাজা বিশ্বাসঘাতক শশীগুপ্ত তাকে সোয়াত্ উপত্যকার কয়েকটি পার্বত্য উপজাতির বিদ্রোহের খবর জানান। কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। পুরুর যুদ্ধে বিপর্যয়ের অনতিকালের মধ্যে অভিসারের রাজা আলেকজান্ডারের সঙ্গে আঁতাত সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে চর মারফৎ

তার কাছে প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। পূর্ব ভারতে মগধের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ভাগল অম্ভি প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলেকজান্ডারের বিশ্বস্ত চর হয়ে উঠলেন। তার কাছ থেকেই আলেকজান্ডার মগদের বিপুল শক্তি, অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও শক্তিশালী গুপ্তচর ব্যবস্থার কথা জানতে পেরে অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না। এছাড়া তিনি নিজে এবং সৈন্যসামন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক আলেকজান্ডারের সমগ্র ভারত-জয়ের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেল।

বিপাশা নদীর তীর থেকে তিনি প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ফেরার পথে মূলতান ও মন্টেগোমারির মল্ল উপজাতিদের দ্বারা গ্রিকরা আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং আলেকজান্ডার গুরুতরভাবে আহত হন। মল্লরা শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়। অনেকেই গ্রিকদের হাতে ধরা পড়ে। অগণিত সাধারণ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সিন্ধুর অববাহিকায় একটি রাজ্যের পরাক্রমশালী প্রধান গ্রিকদের বশ্যতা অস্বীকার করে। সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তার হাতে তিনি পরাজিত হন। ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিপাশা নদীর তীর থেকে আলেকজান্ডার স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। ফেরার পথে তিনি সেখানে বিশালাকৃতি বারোটি বিজয়স্তম্ভ তৈরি করেন। তার সৈন্যবাহিনীর বৃহৎ অংশটি নিয়রকাসের নেতৃত্বে স্বদেশের পথে রওনা হয়। বাকি অংশ সৈন্য নিয়ে আলেকজান্ডার পারস্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়।

আলেকজান্ডারের রাজ্যজয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই গ্রিক বীরের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল তার বিরল সামরিক প্রতিভার সঙ্গে শৃঙ্খলা ও সতর্ক, দক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থার মেলবন্ধন।

চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের প্রস্থানের পর চাণক্য বা কৌটিল্য নামক তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ কীটনীতিজ্ঞর সহায়তায় একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। চন্দ্রগুপ্তের চর ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুশাসন স্থাপনে গুপ্তচরদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ থেকে চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বস্ত ও দক্ষ গুপ্তচর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় চন্দ্রগুপ্ত প্রথমেই পাঞ্জাবকে গ্রিক প্রাধান্য থেকে মুক্ত করেন। এরপর পশ্চিমের নন্দ রাজাদের অধিকৃত রাজ্যগুলির ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। চাণক্যের সহায়তায় পাঞ্জাব থেকে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথমেই তিনি একটি ভুল করলেন। এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল তারই এক গুপ্তচর। চন্দ্রগুপ্তও তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই সময় তার বিশ্বস্ত এক চর একটি গৃহে লুকিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আড়াল থেকে সে লক্ষ করে গৃহকর্ত্রী রুটি সেঁকে তার শিশুপুত্রকে খেতে দিয়েছে। ছেলেটি প্রথমেই রুটির মাঝখান থেকে খেতে শুরু করল। স্ত্রীলোকটি ছেলেকে তিরস্কার করে বলল সে চন্দ্রগুপ্তের মতোই বোকা। ছেলে মাকে প্রশ্ন করে, কেন? স্ত্রীলোকটি বলে, চন্দ্রগপ্ত সম্রাট হতে চায় কিন্তু সীমান্ত অঞ্চল দখল না

করে আগেই রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পাটলিপুত্র আক্রমণ করেছে। তার ফলে নন্দরাজার সৈন্যরা চারপাশ থেকে ঘিরে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তুই ক্ষুধার্ত। রুটির চারপাশ ছেড়ে দিয়ে শুধু মাঝখান থেকে খেলে কি তোর পেট ভরবে?[৩২৯] চরের মুখে একথা শুনে চন্দ্রগুপ্ত নিজের ভুল বুঝে যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করলেন। তিনি সীমান্তবর্তী অনেক জায়গা দখল করে ক্রমশ এগোতে লাগলেন। এবার তার আর একটি ভুল হল। অধিকৃত এলাকায় চন্দ্রগুপ্ত কোনো সৈন্যশিবির স্থাপন না করায় তাদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব অঞ্চলের লোকেরা সমবেত হয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে লাগল। চন্দ্রগুপ্ত ভুল বুঝে বিজিত রাজ্যগুলিতে সৈন্যশিবির স্থাপন করে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত রাজধানী পাটলিপুত্র দখল করেন। এই কাহিনির সত্যতা যাচাই করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে চন্দ্রগুপ্তের সদাজাগ্রত চরেরা সর্বত্র ঘুরে খবর সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে জানাতো।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে গুপ্তচর ব্যবস্থা সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিল। কূটনীতিজ্ঞ চাণক্যের অবদান এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। দেশ ও প্রজারক্ষার স্বার্থে কৌটিল্য* শত্রুর প্রতি যে নীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন তা সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি ভালোই জানতেন বহিঃশত্রু ছাড়াও অভ্যন্তরীণ শত্রুর অভাব হয় না। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা যে-কোনো নীতি-বিগর্হিত কাজ করতে পিছপা হয় না। অম্ভি বা শশীগুপ্তের মতো দেশদ্রোহীর সংখ্যা বিরল নয়। সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতার ধারা বয়ে চলেছে।

কৌটিল্য শাসক এবং শাসিতের বৃহত্তর স্বার্থ ও মঙ্গলসাধনের জন্য গুপ্তচর ব্যবস্থার করার কথা বলেছেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে শত্রুকে দুর্বল ও বিভ্রান্ত করার জন্য কৌটিল্য কয়েকটি কর্মপন্থা নির্দেশ করেন। অনেক সময় বহিঃশত্রু ছাড়াও স্বার্থান্বেষী আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সরাসরি এদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধান করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ শাসনকর্তার উচিত বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান গুপ্তচরের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা। কৌশলে মূল ষড়যন্ত্রকারীকে সরিয়ে দিতে হবে। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাতে শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে না পারে সেদিকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

কৌটিল্যের মতে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শত্রু-মিত্র উভয় রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ রাখা দরকার। গুপ্তচরদের লক্ষ রাখতে হবে যাতে স্বদেশের শত্রু এবং মিত্র রাজ্যের মধ্যে কোনোরকম আঁতাত গড়ে না ওঠে। অনেক সময় তোষামোদ ও চাটুকারিতা দিয়ে শত্রুর মন জয় করা যায়। যে শত্রু লোভী তাকে বশীভূত করার উপায় মূল্যবান ধনরত্ন দান। শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য তার মিত্ররাজ্যগুলির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাকে দুর্বল ও নিঃসঙ্গ করে দিতে হবে[৩৩০]

---

* চাণক্য ও কৌটিল্য একই ব্যক্তি।

বিজিত রাজ্যের জনসাধারণের হৃদয় জয় করার জন্য কৌটিল্য তাদের মধ্যে ধনরত্ন বিতরণের পরামর্শ দিয়েছেন। বিজিগীষু রাজা অনেক সময় শত্রু রাজার কাছে এমন চর পাঠাতেন যারা বন্ধুত্বের ভান করে সহজেই তার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠত। এদের বলা হতো 'উভয়-বেতন চার'। এরা নিজ প্রভু এবং শত্রু উভয়ের কাছে বেতন পেত। কৌটিল্যের মতে শত্রুকে পর্যুদস্ত করার একটি প্রধান অস্ত্র ভেদনীতি। শত্রুকে বিভ্রান্ত করে তার মনোবল ভেঙে দেবার জন্য কৌটিল্য চরদের বিভিন্ন অন্তর্ঘাতমূলক কাজে প্রবৃত্ত হবার নির্দেশ দেন। যথা, গোপনে লুকিয়ে থাকা ঘাতকের দ্বারা অস্ত্রাঘাত, বিষপ্রয়োগ এবং অগ্নিসংযোগ, কৌটিল্য নির্দেশ দেন বিজিগীষু রাজার ছদ্মবেশী চর শত্রুর দুর্গ, গ্রাম এবং নগর সীমান্তে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে রাজকর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশে আনায় সচেষ্ট হবে। শুঁড়িবেশী চর মদে বিষ মিশিয়ে এবং বণিকবেশী চর বিষাক্ত পক্ক মাংস ভাত, দই, তেল, ঘি, দুধ, ছানা জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করে তাদের হত্যা করবে। গবাদি পশু ধ্বংস করার জন্য ঘাস এবং তাদের পানীয় জলে বিষ মেশাতে হবে। অনেক সময় শত্রু শিবিরের চারপাশে বিষাক্ত সাপ এবং হিংস্র জন্তু ছেড়ে দেওয়া দরকার। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক বাহিনীর প্রধানদের বিপাকে ফেলে তাদের হত্যা করার কাজটি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সারতে হবে। শত্রুর জলাধার, শাস্যাগার ধ্বংস শত্রুকে পর্যুদস্ত করার একটি হাতিয়ার। ধনলোভী, মদ এবং নারীতে আসক্ত অথবা সাধুভক্ত রাজাদের ঐসব বস্তুর প্রলোভন দেখিয়ে হত্যা করতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় শিকারি ও মাংসবিক্রেতাদের ছদ্মবেশে চর শত্রুর দুর্গরক্ষীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দুর্গে প্রবেশের পথ জেনে নেবে।[৩০১]

অনেক সময় শকুন, তোতাপাখি, পায়রা, কাক প্রভৃতি পাখির লেজে দাহ্য পদার্থ বেঁধে দিয়ে শত্রুর দুর্গে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। বেজি, বাঁদর, বেড়াল এবং কুকুরদেরও এই কাজে ব্যবহারের কথা জানা যায়। অনেক সময় শত্রু দুর্গে অবস্থিত চরেরা বেজি, কুকুর, বেড়াল এবং বাঁদরের লেজে দাহ্য পদার্থ বেঁধে খড়ের ছাদে তুলে আগুন লাগিয়ে দিত। এর ফলে অনেক বাড়িতেই আগুন লেগে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।

যুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পক্ষীবাহিনীর সাহায্যে খাদ্যশস্য আমদানির অদ্ভুত এক কাহিনি প্রচলিত আছে। কাহিনিটির সত্য মিথ্যে যাই হোক, এখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় খাদ্যশস্য মজুত রাখা যে কতটা দরকার তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের পাণ্ড্যরাজ্যে কোদানগুণরাম অথবা পিরাণ মালাই গিরিশ্রেণি ঘেরা ৩০০টি গ্রামের অধিকর্তা ছিলেন পারি। অঞ্চলটি উর্বর ও সুরক্ষিত ছিল। পারি বিখ্যাত কবি কপিলারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একবার পারির রাজা প্রতিবেশী তিনটি রাজ্যের দ্বারা দীর্ঘকালের জন্য অবরুদ্ধ হয়। শোনা যায় ঐ সময় কপিলারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তোতাবাহিনী শত্রুর আওতার বাইরে একটি দূরবর্তী দুর্গে সংরক্ষিত প্রচুর খাদ্যশস্য পারির শস্যাগারে মজুত করে। ঐ খাবার পারির প্রজা ও সৈন্যবাহিনীকে খাদ্যের যোগান দেয়।[৩০২]

মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর কিছুদিনের মধ্যেই গ্রিকরা ভারত আক্রমণের সুযোগ পায়। মিশরের টলেমি বংশীয় গ্রিক শাসনকর্তা Eurgetes II-র প্রহরীরা পারস্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে অর্ধমৃত এক ভারতীয় নাবিককে উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে যায়। লোকটির ইশারা ইঙ্গিতে Eurgetes বুঝতে পারেন সে ভারতীয়। ভারত মহাসাগরে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে সে ঐ স্থানে এসে পড়েছে। তাদের জাহাজ ডুবে গেছে। সঙ্গী সাথীরা মৃত। ভারতে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিলে রাজা লোকটিকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ভারতীয় নাবিকটি Eudoxus Cyzicus সহ আরও কয়েকজন নাবিককে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে।[৩৩৩]

আলেকজান্ডারে সেনাপতি সিরিয়ার অধিপতি সেল্যুকাসের রাজ্যভুক্ত ছিল ব্যাকট্রিয়া এবং পার্থিয়া। হিন্দুকুশ গিরিপথ ধরে ব্যাকট্রিয় গ্রিকরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন অশোকের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। উত্তরাঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অশোকের এক বংশধর জলৌক স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। কনৌজ পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার হয়। বীরসেন গান্ধার অধিকার করেন। বিদর্ভ স্বাধীন হয়ে যায়। পলিবিয়াসের ভারত বিবরণ থেকে জানা যায় বীরসেন-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন সুভাগাসেন। এই সময় অ্যান্টিয়োকাস হিন্দুকুশ অতিক্রম করে গান্ধার রাজ্যে প্রবেশ করেন। তার সঙ্গে সুভাগাসেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।*

সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যাবিলন সহ অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্র থেকে জলপথ ও স্থলপথে বণিক ও ভ্রমণকারীর দল ভারতবর্ষে আসত। স্থলপথে তক্ষশীলা ও পাঞ্জাব মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বেশ কয়েকটি পথ দিয়ে সিন্ধুর বদ্বীপ অঞ্চল এবং কাবুল উপত্যকার সাথে পাটলিপুত্রের সংযোগ রক্ষা করা হতো। ভারতের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য নগরগুলির মধ্যে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল। ঐসব রাস্তা শান্তির সময় বণিক ও ভ্রমণকারী এবং সৈন্যরা যুদ্ধের সময় ব্যবহার করত। ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশের ঐ সব রাস্তা সম্পর্কে ব্যাকট্রিয়, পার্থিয়, শক এবং অন্যান্য আক্রমণকারীর সম্যক জ্ঞান ছিল। স্কাইলাকস, হেরোডোটাস, টোসিয়াস, স্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ান এবং মেগাস্থিনিস ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে নিখুঁত চিত্রটি তুলে ধরেন তাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে পারসিক, গ্রিক, ব্যাকট্রিয় গ্রিক এবং অন্যান্য আক্রমণকারীদের একটি সম্যক ধারণা জন্মায়। ভারতে অনুপ্রবেশের আগে সুযোগ্য গুপ্তচরের মাধ্যমে আক্রমণকারীরা এদেশের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সংবাদ গ্রহণ করে। পারসিক, গ্রিক, শক, হুণ এবং মুসলিম আক্রমণকারীদের সুদক্ষ গুপ্তচর ব্যবস্থার সঙ্গে উন্নত রণকৌশল, আত্মবিশ্বাস এবং অদম্য সাহস তাদের

---

* 'Antiochus-Subhagasena alliance may also have been directed against the imperial Mauryas of Pataliputra... Greek intrigue may have played a part in the disintegration of the empire at the Greek raids.'[৩৩৪]

সফলতার কারণ ছিল। ভারতীয় নৃপতিরা ছিলেন কূপমণ্ডুক। তারা নিজেদের মধ্যে কলহে, পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে গুপ্তচর ব্যবহার করতেন। বহির্বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না।* এসব ব্যাপার জানার জন্য তারা কখনো গুপ্তচর সংস্থাকে কাজে লাগাতেন না।

ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে শক্তিশালী কোনো রাজবংশের পতনের পরে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ বার বার বিদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেশ কিছু শাসকবর্গ বিদেশি অনুপ্রবেশের পথ প্রস্তুত করেছে। আলেকজান্ডারের সঙ্গে অম্ভি ও শশীগুপ্তের আঁতাত, অ্যান্টিয়োকাস-সুভাগাসেন চুক্তি, কুষাণরাজ কদ্‌ফিসিসের সঙ্গে গান্ধার রাজের চুক্তি বিদেশিদের ভারত আক্রমণের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল। আলেকজান্ডারের প্রত্যাগমনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধকে কেন্দ্র করে যে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেন তার পশ্চাতে সুদক্ষ গুপ্তচর সংস্থার অবদান অস্বীকার করা যায় না। কৌটিল্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাবকে বিদেশিদের হাত থেকে মুক্ত করে পশ্চিমে নন্দ রাজাদের হস্তগত অঞ্চলগুলি দখল করে নেন। চাণক্য বা কৌটিল্য পাঞ্জাব থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যজয়ে সহায়তা করেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় রাজা শক্তিশালী ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করে মগধে প্রবেশ করেন। রাজধানী পাটলিপুত্র তার হস্তগত হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তার সামরিক শক্তি ও সুদক্ষ গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতায় কোনো বিদেশি ভারত আক্রমণ করতে সাহস করেনি।

২৮২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যুর পর বিদেশি গুপ্তচর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার খবর সংগ্রহ করে। *যুগপুরাণ* ও *গার্গীসংহিতা* থেকে জানা যায় অশোকের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে শালিসুকের রাজত্বকালের অবসানে গ্রিকরা মধ্যদেশ অধিকার করে। অযোধ্যার সাকেত, পাঞ্চাল, মথুরা ও পাটলিপুত্র মধ্যদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে যখন তার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ সিংহাসন লাভ করেন তখন তিনি গুপ্তচর মারফৎ জানতে পারেন গ্রিকরা দিল্লির একটি পথ ধরে সুঙ্গ রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। সেইসময় তিনি পুত্র অগ্নিমিত্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে বলেন। বিজিগীষু রাজা শুধুমাত্র বিজয়োৎসব পালনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন এমন নয়, শত্রুর শক্তি ও কৌশল পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় তারা এ নীতি গ্রহণ করতেন। যজ্ঞের ঘোড়ার সঙ্গে থাকত অস্ত্রসজ্জিত শতাধিক রাজপুত্র, তরবারি হাতে যোদ্ধার দল, অগ্রগামী দূত (প্রাচীনকালে যে কর্মচারী জনসাধারণের কাছে উৎসবের কথা ঘোষণা করে তা পালনের আয়োজন করত) বল্লম ও তিরধনুকধারী প্রহরী এবং শতাধিক ঘোড়া। যজ্ঞের ঘোড়ার

---

* '...Indian rulers had no occasion or temptation to carry on campaign outside India. They lived and fought in their little world, vast enough for their ambitions and enterprises and cared little for what was happening in the outside world.[৩৩৫]

অনুগামীরা প্রতিবেশী, উদাসীন (neutral), মিত্র এবং শত্রু রাজ্যের গোপন খবর সংগ্রহ করত। যবনদের অনুপ্রবেশের সম্ভাব্যতা কালে পুষ্যমিত্রের এই যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন তাৎপর্যপূর্ণ। পুষ্যমিত্রর যজ্ঞের প্রহারায় নিযুক্ত ছিলেন পৌত্র বসুমিত্র এবং আরও একশত রাজপুত্র। যজ্ঞের ঘোড়া সিন্ধু নদের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হয়। সুঙ্গ রাজপুত্রদের গুপ্তচররা ঐ স্থানে যবনদের উপস্থিতির কথা আগেই জানতে পারে। ঘোড়াটিকে যবন সৈন্যরা ওখানেই আটক করে। যুদ্ধ শুরু হয় এবং যবনরা (ব্যাকট্রিয় গ্রিক) পরাজিত হয়।[৩৩৬]

ব্যাকট্রিয় গ্রিকরা দীর্ঘকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য করে। তাদের অন্তর্কলহ ও দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি শকরা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। একটি শক্তিশালী রাজবংশের পতনের পর যেভাবে ভারতে বহিরাক্রমণ ঘটতো তাতে স্বাভাবিক ভাবে মনে হয় অনুপ্রবেশকারীদের গুপ্তচররা সর্বদাই ভারতের সমগ্রিক পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করত। এছাড়া সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিদেশি আক্রমণণকারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিক্ষুব্ধ ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের শত্রুপক্ষে যোগদান অনুপ্রবেশকারীদের সাফল্য অর্জনের পথ প্রশস্ত করে।

অষ্টম শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে আরবীয়রা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনায় ভারতের নির্দিষ্ট সীমারেখা, পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের সীমান্ত, উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও আগে সুলেমান, অল-মাসুদি, অল-ইদ্রিসি, সুর-উল-বালদাম প্রভৃতি আরব বণিকগণ তাদের ভৌগোলিক বিবরণে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ পদার্থ, ভারতীয় নৃপতিদের অপরিমেয় ধন ঐশ্বর্য এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের রাস্তার কথা উল্লেখ করেন। দীর্ঘকাল ধরে সিন্ধুর (upper Indus) পশ্চিম তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে আরবদের ঘাঁটি ছিল। তারা নিয়মিত ভারতীয় নৃপতিদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। ফলে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামরিক শক্তির সমস্ত খবর তারা রাখত। তার ফলে তাদের ভারত আক্রমণের পথ সুগম হয়। একের পর এক মুসলিম আক্রমণে দ্বিধাবিভক্ত, বিবদমান হিন্দুরাজ্যগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ভারতে মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বালাজুরি রচিত আরবীয় গ্রন্থ *চাঁচনামা* থেকে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের প্রথম ভারত আক্রমণের কথা জানা যায়। আরবের শাসনকর্তা অল্‌হেজ্জাজ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা মহম্মদ বিন কাশিমকে সিন্ধুদেশ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ দাহির। কাশেমের গুপ্তচররা সিন্ধু আক্রমণের আগে ঐ অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ বৌদ্ধ এবং পুরোহিত শ্রেণিকে দাহিরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। দাহিরের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য ছিল না। সুদক্ষ গুপ্তচরের অভাবে দাহির যথাসময়ে সে কথা জানতে পারেননি। সিন্ধুপ্রদেশের জল ও স্থলপথ আক্রমণকারীদের নিকট উন্মুক্ত ছিল। সীমান্তরক্ষার উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী দাহিরের ছিল না। এসব কারণে আরবদের সিন্ধু বিজয় সহজ হয়ে ওঠে।

মকরান থেকে মহম্মদ বিন কাশিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেবল বন্দরের দিকে অগ্রসর হন। জাঠ, মেদ্ এবং বেশ কিছু উপজাতি আরবদের দলে যোগ দেয়। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে কাশিম দেবলে উপস্থিত হলে দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কথিত আছে দেবল বন্দরের প্রবেশদ্বারে নগর মন্দিরের শীর্ষে একটি বৃহৎ লাল পতাকাবাহী দণ্ডের সাথে একটি মন্ত্রপূত প্রস্তরখণ্ড বেঁধে দেওয়ায় আরবরা বার বার ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে এক বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ দাহিরকে পরিত্যাক করে আরবদের সঙ্গে যোদ দিয়ে বিপদ নিবারণকারী মন্ত্রপূত প্রস্তরটির কথা তাদের কাছে প্রকাশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আরবরা পতাকাবাহী দণ্ডটিকে আঘাত করে মন্ত্রপূত প্রস্তরটি ভেঙে ফেলে। ভীত সন্ত্রস্ত দেবলবাসীর মনোবল ভেঙে যাওয়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কাশিম ও তার সৈন্যদল বেশ কয়েকদিন ধরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। অজস্র মানুষ তাদের হাতে ধরা পড়ে। তাদের অনেককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। ৭০০ সুন্দরী রমণীকে মুসলিমরা বন্দি করে নিয়ে যায়। অল-হজ্জাজ পারিষদবর্গ এবং সৈন্যদের মধ্যে সিন্ধু সুন্দরীদের নির্বিচারে বণ্টন করা হয়।

অতঃপর কাশিম মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। প্রথমে তাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এখানেও এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির সহায়তায় কাশিম মুলতান শহরের জলসরবরাহকারী ঝরনাটি কেটে দিয়ে সহজেই মুলতান দখল করে নেয়।

তবে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। তারা বৃহত্তর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন,

> The Arabs had conquered Sindh but the conquest was only an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results. স্যার উলস্‌লি হেগের মতে Of the Arab conquest of Sindh, there is nothing more to be said. It was a mere episode in the history of India and affected only a small portion of the fringe of that vast country...

কিন্তু মুসলিম আগ্রাসন থেমে থাকেনি। আরবদের প্রদর্শিত পথ ধরে ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিমরা বার বার ভারতবর্ষে অভিযান করেছে। এভাবেই শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছরের অধিককাল মুসলিমরা ছিলেন ভারতের শাসক।

সুদূর মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসকগণ যে সফলতার সঙ্গে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে এত দীর্ঘসময় ধরে রাজত্ব করতে পেরেছিলেন তার মূলমন্ত্র কী? অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ রাজকর্মচারী নিয়োগ, কর্মঠ প্রয়াস, পররাষ্ট্রনীতিতে বাস্তব কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ এবং কর্মদক্ষ বিশ্বস্ত গুপ্তচর ব্যবস্থা মুসলিম শাসকদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে। এদেশের শাসন ব্যবস্থায় মুসলিম শাসকদের অনেক জটিলতার সম্মুখীন

হতে হয়। সে কারণে তারা গুপ্তচর সংস্থার পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করেন। যুদ্ধের সেনাবাহিনীর গতিবিধির সুবিধার জন্য গুপ্তচররা পথনির্দেশিকা তৈরি করত। সীমান্ত রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করতেন মুসলিম শাসক গোষ্ঠী। যুদ্ধকালে পশ্চাৎগামী সৈন্য, অগ্রগামী সৈন্য এবং রণকৌশল পর্যবেক্ষক এবং নির্ধারণকারীদের মধ্যে গুপ্তচররা সংযোগ রক্ষা করে চলত। সৈন্যদের মধ্যে কোনো শৈথিল্য বা শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিলে গুপ্তচররা তৎক্ষণাৎ তার কারণ অনুসন্ধান করত। গুপ্তচর প্রদত্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সমরনায়কগণ সৈন্যদের গতিপথের নির্দিষ্ট মানচিত্র তৈরি করতেন। যুদ্ধে বিপর্যয়, সাফল্য এবং মৃতের সংখ্যা নির্ণয়ের দায়িত্ব ছিল গুপ্তচরের ওপর। গুপ্তচররা যুদ্ধশেষে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে উভয়ের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করত। শত্রুর মনোবল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে গুপ্তচররা অনেক সময় বিষ প্রয়োগ করে তাদের জলাশয় এবং শস্যভাণ্ডার ধ্বংস করে দিত। নববিজিত রাজ্যের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রভাবশালী ব্যক্তি, পৌরসংস্থা প্রভৃতিকে অর্থ এবং মূল্যবান উপহার দিয়ে বশীভূত করার কাজে নিযুক্ত হতো গুপ্তচর।

বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ ভারতীয় নৃপতিদের প্রধান দুর্বলতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি কে মজুমদার বলেন, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসকগণ কৌটিল্য প্রমুখ প্রাজ্ঞ কূটনীতিবিদদের উপদেশ অনুযায়ী গুপ্তচর ব্যবস্থা সমানভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্যসাম্রাজ্য পতনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মূলত ঐ পথ দিয়ে অধিকাংশ আক্রমণকারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো মুষ্টিমেয় ভারতীয় নৃপতি, যথা গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত এবং পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধন ছাড়া অন্য কারোর তেমন সুদক্ষ সেনা ও গুপ্তচর ছিল না। কনৌজের পতনের পর শতধা বিভক্ত ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। এ পরিস্থিতিতে গুপ্তচর সংস্থার কর্মতৎপরতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান, নব নব সামরিক কলাকৌশল, উন্নত মানের অস্ত্রের আবিষ্কার সম্পর্কে ভারতীয় রাজাদের কোনো ধারণা ছিল না। পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের খবর ভারতীয় নৃপতিদের জানা ছিল না।

বহির্বিশ্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়াও ভারতীয় রাজন্যবর্গের উন্নাসিকতা ছিল। বিখ্যাত পর্যটক অলবিরুনী ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেন: ভারতীয়দের ধারণা যে তাদের মতো দেশ, রাজা, ধর্ম এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। রাজপুতদের জাত্যভিমান এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রাম তাদের সামরিক শক্তি ও গুপ্তচর ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়। ঐতিহাসিক টড-এর মতে রাজপুতদের অহিফেনের আসক্তি তাদের দুর্বলতা ও পতনের উল্লেখযোগ্য কারণ।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে যুদ্ধে হাতির ব্যবহার হতো। পুরু এবং পরবর্তীকালে

পাঞ্জাবে আনন্দপালের বিপর্যয়ের মূলে ছিল হাতি। শত্রুর দ্রুতগামী অশ্বের ব্যবহার রাজপুতদের অন্যতম কারণ ছিল। বীরত্ব প্রদর্শন করেও রাজপুতরা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

সি ভি বৈদ্য প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ হিন্দুশক্তি পতনের জন্য জাতিভেদ প্রথাকে দায়ী করেছেন। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের হাতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিগৃহীত হতো বলে তাদের মনে সহজাত এক আক্রোশ জন্মায়। ফলে জাতিভেদহীন মুসলিম সমাজ তাদের সহজে আকৃষ্ট করে এবং অনেক হিন্দু মুসলিম ধর্ম গ্রহণ কর। গ্রিক আক্রমণ থেকে শুরু করে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদ, সামরিক দুর্বলতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দেশের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে গুপ্তচরদের বিদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কোনো উপায় ছিল না।

যুদ্ধে বিষকন্যা ও বিষের প্রয়োগ

শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য বিষপ্রয়োগে তাদের জনপদ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রভৃতি ধ্বংস করার প্রক্রিয়াটি অতি প্রাচীন। সংস্কৃত সাহিত্যে শত্রু নির্ধনের জন্য বিষকন্যা নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন উপকথা *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে বিষকন্যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার বেশ কয়েকটি কাহিনির কথা জানা যায়। সপ্তম শতকে বিশাখ দত্তের লেখা বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটক গ্রন্থ *মুদ্রারাক্ষস*-এ বিষকন্যার কাহিনি আছে। মগধের রাজা নন্দ চন্দ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হবার পর তার মন্ত্রী রাক্ষস বলছেন, 'কর্ণ অর্জুনকে হত্যা করার জন্য যেমন একটি শক্তিশালী বল্লম (lance) সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন আমি তেমনই চন্দ্রগুপ্তকে নিধনের উদ্দেশ্যে একটি ভয়াবহ বিষকন্যা পালন করেছি।' কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্তে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তার বন্ধু পবর্তকের মৃত্যু হয়েছিল। তবে পরিশিষ্ট পর্বে বলা হয়েছে ঐ কন্যাটির পালক ছিলেন স্বয়ং নন্দন[৩৩], পরাজিত নন্দ রাজার মন্ত্রী প্রাসাদেই বিষকন্যাটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বন্ধু পবর্তক সহ প্রাসাদের রত্নাগার অধিগ্রহণের জন্য যখন প্রবেশ করলেন তখন ঐ সুন্দরী কন্যাটি তাদের নজরে পড়ল। পর্বতক অত্যন্ত মোহিত হয়ে মেয়েটিকে বিবাহ করতে চাইলেন। চাণক্য ঐ দুজনের বিবাহের আয়োজন করলেন। বিবাহকালে হস্তবন্ধন অনুষ্ঠানে যজ্ঞের আগুনে দুজনের হাত ঘেমে উঠল। পবর্তক বিষক্রিয়ায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

এ-ধরনের বেশ কিছু কাহিনি প্রচলিত আছে। বিষকন্যা প্রসঙ্গে সঠিক ধারণা করা মুশকিল। তবে বিষকন্যা সম্পর্কে যে একটি ভয়ের বাতাবরণ ছিল তা এসব কাহিনি থেকে বোঝা যায়। *শুভবহুত্তরিকথা* গ্রন্থের ৭১তম গল্পটিতে বলা হয়েছে যে রাজা ধর্মদত্ত কামসুন্দর নামে এক রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার সুচতুর মন্ত্রী মেয়েটি বিষকন্যা বুঝতে পেরে ধর্মদত্তকে এই বিবাহ থেকে বিরত করেছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি এমন বিষকন্যা ছিল যার দৈহিক সংস্পর্শে মৃত্যু ছিল অবধারিত? চাণক্য বেশ কিছু অবিশ্বাসিনী রানির কথা উল্লেখ করেন যারা অলংকার, কপোল, স্তন এবং নখে তীব্র বিষ মাখিয়ে স্বামীদের দৈহিক মিলনে প্রলুব্ধ করে হত্যা করেছিলেন। আবার এমনও মনে করা হয় জ্যোতিষীরা অনেক সময় নবজাত কন্যার কোষ্ঠী বিচার করে এদের কারুর মধ্যে বিষকন্যা লক্ষণ দেখা দেবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতেন। এ প্রসঙ্গে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে বিষকন্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন কাহিনি ইউরোপে এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে বিখ্যাত গ্রন্থ *গোস্তা রোমানিরাম*-এ সগৌরবে এরা স্থান পেয়েছে। কথা হচ্ছে সত্যিই কি এইসব কন্যা বিষের দ্বারা প্রতিপালিত হতো না দেহের কোনো গোপন স্থানে বিষ লুকিয়ে রেখে এরা তা শত্রুর ওপর প্রয়োগ করত?

কথিত আছে, প্রাচীন ভারতে গোপনে অনেক সময় অভিজাত এবং সাধারণ পরিবারের সদ্যোজাত সুন্দরী কন্যাদের অপহরণ করে তাদের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে প্রতিপালন করা হতো। এদের মধ্যে অনেকের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হতো। যারা বেঁচে থাকত তাদের নৃত্য গীত ইত্যাদি বিভিন্ন কলাবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দিয়ে পারদর্শিনী করে তোলা হতো। এসব বিষকন্যার দৈহিক সংস্পর্শে মৃত্যু ছিল অবধারিত।

বিষকন্যার কিছু চমকপ্রদ কাহিনি গ্রিক বীর আলেকজান্ডারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একবার এক ভারতীয় নৃপতি অনেক মূল্যবান উপহারের সঙ্গে সুন্দরী একটি বিষকন্যা প্রেরণ করেন। আলেকজান্ডারের সঙ্গে ছিলেন জ্ঞানী অ্যারিস্টটল। তিনি ৩৪২ খ্রি. পূর্বাব্দে কিশোর আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আজও আছেন তিনি গ্রিক বীরের সঙ্গে। মেয়েটিকে দেখে অ্যারিস্টটল বুঝতে পারেন সে বিষকন্যা। তিনি আলেকজান্ডারকে সাবধান করে বলেন এর সংসর্গে মৃত্যু নিশ্চিত। অ্যারিস্টটল-এর অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

স্পেনে *সি-জ্যুলেম-ডি-কার্ভেরা রোমানিয়া* গ্রন্থে একটি কাহিনির অবতারণা করেছেন। কোনো এক রাজা জ্যোতিষী গণনার দ্বারা জানতে পারেন যে আলেকজান্ডার নামক এক ব্যক্তির হাতে তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি অভিজাত পরিবারের কয়েকটি সুন্দর শিশুকন্যাকে বিষ দিয়ে পালন করার ব্যবস্থা করেন। এদের মধ্যে একটি মেয়ে বেঁচেছিল। কালে সে হয়ে উঠল অসামান্য সুন্দরী আর নিপুণ বীণাবাদিকা। যাই হোক, সেই রাজা একবার এক শত্রুরাজ্যে মেয়েটিকে পাঠালেন। শত্রুরাজ ঐ সুন্দরীর বীণার সুরে আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিজের শিবিরে আমন্ত্রণ জানালেন। চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য রাজা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তবে যার জন্য এই কন্যাটিকে পালন করা সেই আলেকজান্ডারকে কিন্তু ঐ রাজা ধ্বংস করতে পারলেন না।

সম্রাট দারায়ুস নাকি একবার আলেকজান্ডারকে একটি বিষকন্যা উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আলেকজান্ডার তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেলেন। আবার অ্যারিস্টটল তাকে বাধা দেন। পরিবর্তে দুজন ভৃত্যকে নিয়োগ করা হয়।

মেয়েটিকে চুম্বনের সাথে সাথে তাদের মৃত্যু হল।

মধ্য এশিয়ার ছোটো একটি রাজ্য সিজিরি। ৩২৬ খ্রি. পূর্বাব্দে ঐ রাজ্যের উপকণ্ঠে আলেকজান্ডার শিবির সন্নিবেশ করেন। প্রাসাদ শিখর থেকে বিশাল গ্রিক বাহিনী দেখে সিজিরির রানির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো। মনে পড়লো অতীতের কথা। কোনো এক সময় যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে রানি জানতে পারেন ওলিম্পিয়াসের পুত্র আলেকজান্ডার ভবিষ্যতে ধ্বংস করবেন সিজিরি। ম্যাসিডন অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপ ও রানি ওলিম্পিয়াসের পুত্র আলেকজান্ডার তখনও শৈশব অতিক্রম করেনি। রানি তার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করলেন, অনিন্দ্যসুন্দর ঐ শিশুর মুখে দেখলেন তার ভবিষ্যৎ চরিত্রের প্রতিফলন। বুঝলেন যৌবনে আলেকজান্ডার হয়ে উঠবেন সুরাসক্ত ও নারীবিলাসী।

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না। অভিনব এক পরিকল্পনা করলেন রানি। সিজিরি গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ সর্পসংকুল রাজ্য। সদ্যোজাতা এক কন্যাকে রানি সাপের বিষ দিয়ে পালন করতে লাগলেন। দেড় মাসের মধ্যে মেয়েটি এত বিষাক্ত হয়ে উঠল যে ওর সংস্পর্শে মৃত্যু ছিল অবধারিত। রনি ওকে একটি খাঁচায় পুরে রাখলেন। এরপর ধীরে ধীরে ওকে সামান্য খাবারে অভ্যস্ত করানো হল। মেয়েটি বেড়ে উঠতে লাগল। সমস্ত শিক্ষায় রানি তাকে নানা গুণের অধিকারিণী করে তুললেন। কালে সে হয়ে উঠল অপরূপা, লাস্যময়ী।

গ্রিক শিবিরে যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। আলোচনায় ব্যস্ত আলেকজান্ডার, সেনাপতি সেলুকাস, পিউপেসটান, পীথন ও ক্রিওমেনস। উপস্থিত আছেন অ্যারিস্টটল।

অপরাহ্ণ বেলা। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যাবার আগে আকাশ হয়েছে লাল। এমন সময় সিজিরির রানির দ্রুত সসম্ভ্রমে আলেকজান্ডারকে অভিবাদন করে জানালেন তার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ রানি পাঠিয়েছেন নানা মহার্ঘ দ্রব্য, সঙ্গে রয়েছে সিজিরির সেরা রূপসি সেই কন্যা। সম্মোহিত হলেন আলেকজান্ডার। এবারও মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটল আলেকজান্ডারকে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে নিরীক্ষণ করে বললেন ও বিষকন্যা। সযত্নে আটকে রাখা হল মেয়েটিকে। গভীর রাতে অ্যারিস্টটল আলেকজান্ডারের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে তাকে নিয়ে মেয়েটির কাছে উপস্থিত হলেন।

দার্শনিক অ্যারিস্টটল ছিলেন প্রাণীবিদ্যা বিশারদ ও প্রকৃতিবিদ। ইতিমধ্যে একরকম ওষধি লতার নির্যাস দিয়ে মেয়েটিকে ঘিরে তিনি রচনা করেন একটি বিরাট বৃত্ত। এক ভৃত্য অত্যন্ত বিষধর একটি সাপ ছেড়ে দিল ঐ বৃত্তের ভিতর। মেয়েটির চারপাশে সাপটি বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল। রুদ্ধ নিশ্বাসে বিস্ময়ে প্রায় অবিশ্বাস্য এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন আলেকজান্ডার। এবার অ্যারিস্টটল এক যুদ্ধ বন্দিকে আদেশ করলেন মেয়েটিকে চুম্বন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হল ঐ বন্দির। অ্যারিস্টটল-এর ইঙ্গিতে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে লুটিয়ে পড়লো বিষকন্যা।

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষে 'elbes' নামে একরকম বিষাক্ত লতার চাষ করা

হয়। কোনো কোনো ভারতীয় রাজা শত্রু সংহারের উদ্দেশ্যে অপহৃত সদ্যোজাত শিশুকন্যার দোলনা, বিছানা এবং পোশাকের ভেতর বেশ কিছুদিন ধরে ঐ বিষাক্ত লতা রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর তার দুধে বিষ মেশানো হতো। বিষাক্ত খাবারে অভ্যস্ত মেয়েটি কালে হয়ে উঠত বিষকন্যা। শত্রুকে সরাসরি যুদ্ধে আহ্বান না করে মিত্রতার প্রস্তাব দিয়ে নানা উপহারের সঙ্গে পাঠানো হতো বিষকন্যা। তার সঙ্গে দৈহিক সংসর্গে এসে শত্রুর মৃত্যু হতো।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দকালীন গুজরাটের সুলতান মামুদ শাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা জানা যায়। পুত্র মামুদকে যাতে কেউ বিষপ্রয়োগে করে হত্যা করতে না পারে সেজন্য তার পিতা শৈশব থেকে তাকে বিষপানে অভ্যস্ত করে তোলেন। কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মামুদ তাকে বিবস্ত্র করে নিয়ে আসতেন। এরপর বিষাক্ত লতাপাতার সঙ্গে ঝিনুক চূর্ণ মিশিয়ে ভালো করে চিবিয়ে মামুদ সেই লোকটির সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটির মৃত্যু হতো। মামুদ শাহর হারেমে তিন চার হাজার রমণী ছিল। প্রতি রাতে নতুন নতুন মেয়ে মামুদের শয্যাসঙ্গিনী হতো। ভোরবেলায় পড়ে থাকত সেই হতভাগ্য কন্যার মৃতদেহ। শোনা যায় মামুদ শাহ কোনো পরিধেয় বস্ত্র দ্বিতীয় বার ব্যবহার করতেন না। তার পরিত্যক্ত পোষাকের স্পর্শেও নাকি মৃত্যু ঘটতো। শত্রু নিধনের উদ্দেশ্যে মামুদ গুপ্তচর এবং বিষকন্যার পরিবর্তে নিজের বিষাক্ত শরীর ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে অহিফেন বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনকারীদের কথা বলা যায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশা বন্ধ করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বারবোস নামক এক ব্যক্তির জবানি থেকে জানা যায় প্রতিদিন সামান্য পরিমাণে বিষ খেতে খেতে তিনি তাতে আসক্ত হয়ে পড়েন। তার শরীর এমনই বিষাক্ত হয়ে উঠল যে একটা মাছি তার গায়ে বসলে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত। বারবোস-এর সঙ্গে দৈহিক মিলনে তার সঙ্গিনীদের মৃত্যু হতে লাগল। এরপর থেকে তিনি কোনো রমণীর সঙ্গে মিলনকালে তার মুখে একটি বিষ নিরোধক আংটি পুরে দিতেন। তাতে অবশ্য মেয়েটি রক্ষা পেত। বারবোস কিন্তু বিষ না খেয়ে থাকতে পারতেন না। কারণ তাতে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিত।

এসব কাহিনি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় বিষকন্যা ও বিষ শত্রুর ধ্বংস সাধনে ব্যবহার করা হতো। মনু বিজিগীষু রাজাকে শত্রুর মনোবল ভেঙে দেবার জন্য ঐ রাজ্যের ঘাস গাছপালা, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল এবং জ্বালানী দ্রব্যে বিষ মেশানোর পরামর্শ দেন।[৩৮] সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে বিষাক্ত জলাশয়ে জল আঠালো, ফেনিল, তীব্র গন্ধযুক্ত ও কালো হয়ে ওঠে। ঐ জলে ভেক ও মাছ মরে ভেসে ওঠে। পশুপাখিরা ঐ জলের ধারে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। মানুষ, ঘোড়া, হাতি ঐ জলে স্নান করলে বমন, জ্বর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় তারা অচৈতন্য হয়ে যায়। দেহের বিভিন্ন অংশ ফুলে যায়। এই অবস্থায় ঐ জল পরিশ্রুত করার জন্য অশ্বকর্ণ,

আশন, পরিভদ্র, পটল, সিদ্ধক, মোক্ষক, রামদ্রুম এবং সোমবল্ক প্রভৃতি পুড়িয়ে তার ভস্ম ঠান্ডা করে জলাশয়ে ছড়িয়ে দিতে পারে। এতে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।[৩৯]

বিষ এবং বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগ আধুনিক যুদ্ধে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধে (১ম ও ২য়) বিষাক্ত গ্যাস অসংখ্য মানুষের প্রাণনাশ করে। ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যবহৃত কুয়োর জলে নেপালিরা অ্যাকোনাইট চূর্ণ মিশিয়ে তা বিষাক্ত করে তোলে। (দ্র. Account of the kingdom of Nepal (1819) Francis Hamilton) মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য বিষ ব্যবহার করা হয়েছিল (দ্র. E J Eyre-এর Journals of Expeditions of Discovery into Central Australia, Vol I, 1845)। Rowick সাহেব *Last of the Tasmanian* গ্রন্থে জানিয়েছেন টাসমানিয় আদিবাসীদের ধ্বংস করার জন্য তাদের বিষাক্ত ভেড়ার মাংস খেতে দেওয়া হতো।A A Roberts লিখিত গ্রন্থ *The Poison War* (1915, p. 281) থেকে জানা যায় দ্বিতীয় ইঙ্গ-বুওর যুদ্ধে জার্মান অধিকৃত দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় জেনারেল বোথার অভিযানকালে ব্যবহার্য কুয়োর জলে মার্কারি ক্লোরাইড মিশিয়ে তা বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। J J Van Yschudi Reisen durch Sjidamerik, vol II, p. 262-তে দেখা যায় পোর্তুগিজরা ব্রাজিলের আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করার জন্য গুটিবসন্ত ও স্কার্লেট জ্বরের জীবাণু ব্যবহার করে।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার সাধারণ সৈন্য হিসেবে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তার *Mein Kamps* (p. 187) গ্রন্থ থেকে জানা যায় ১৯১৭ সালের ১৩-১৪ অক্টোবর ব্রিটিশ বাহিনী রাতে দক্ষিণ ইয়োপ্রেস ফ্রন্টে জার্মান সৈন্যদের ওপর বিষাক্ত বোমা বর্ষণ করে। বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে জার্মানি সৈন্যসহ স্বয়ং হিটলার ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

---

* A W and M W Blyth-এর Poisons– their effects and detection (new ed 1920), C G S Thompson-এর Posion Mysteries 1923, M P Naidu-র The History of Professional Poisoners and Coiners of India, Madras 1912, T N Windwor-এর *Indian Toxicology*, Col, 1906 প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আমরা আধুনিক যুদ্ধে বিষ ব্যবহারের কথা জানতে পারি।

রাষ্ট্রদূত ও তার আচরণ

কূটনীতি

প্রাচীন ভারতে ছোটো বড়ো অসংখ্য রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক (diplomatic) সম্পর্ক ছিল।* প্রখ্যাত ঐতিহাসিক H C Chatterjee বলেন, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রগুলি অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মঙ্গলসাধনের জন্য পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কূটনৈতিক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুপ্তচর ব্যবস্থাকে তিনভাবে ভাগ করা হয়, যথা, রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক। কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে (Ambassador) প্রাচীন ভারতে দূত বলা হতো। আধুনিককালে দূতকে বলা যেতে পারে আইন দ্বারা সুরক্ষিত পদমর্যাদাসম্পন্ন চর।

বৈদিক সভ্যতা সূচনার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে কূটনীতির সূচনা। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সিন্ধবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ, পূর্বভারত এবং মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। স্যার জন মার্শালের মতে খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চল এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন সুমের অঞ্চল থেকে আগত এক জাতি সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা। আবার কেউ কেউ বলেন সিন্ধু অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড়। সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং পাঞ্জাবের বিস্তৃত অঞ্চলে জুড়ে ছিল দ্রাবিড় জাতির বাস। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই শাখার লোকেরা এখনও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে গঠিত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা। হুইলারের মতে সিন্ধু ও মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা সমসাময়িক। এই দুটি অঞ্চলে একই ধরনের বেশ কিছু শিলমোহর, হাড়ের অলংকার ও ষাঁড়ের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। হুইলার শিলমোহরগুলির সময়কাল খ্রি. পূ. ২৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দের মধ্যে নির্ধারণ করেছেন। মহেঞ্জোদারোর নিম্ন অববাহিকা এবং উর, কিস, লাগাস, সুসা প্রভৃতি অঞ্চলে একই ধরনের প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারো ও মেসোপটেমিয়ার মানুষ এক নমুনার রূপার আংটি ব্যবহার করত। কোনোন ও হরপ্পায় একই রকমের পুঁতির প্রচলন দেখা যায়।

---

* Diplomacy is a method of negotiation, persuasion and conciliation for promoting the common interests of different nations and adjusting those interests which are opposed... V R Dikshitae, p. 301.[৪৪০]

মহেঞ্জোদারো ও মেসোপটেমিয়ায় পুঁতির মতো সোনার দানা দিয়ে মালা গাঁথা হতো।* কোনস-এ প্রাপ্ত সোনার দানা সম্ভবত ১৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে মধ্য মাইয়োনিয়ান (iii) মন্দিরের স্বর্ণ ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করা হতো। যাই হোক, এসব নিদর্শন রেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সিন্ধু ও হরপ্পার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, সুমের, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

ভারতবর্ষে আর্যবসতি স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে অনার্যদের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়। আর্য পুরোহিতের নির্দেশে গোষ্ঠী দলপতি প্রথমেই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট শত্রু (দাস) ধ্বংসের জন্য বর প্রার্থনা করতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে ভূমি বণ্টনের চুক্তি নিয়ে আর্য দলপতির দূত অনার্য গোষ্ঠীনেতার কাছে পাঠানো হতো।[৩৪২] আর্যদের নিজেদের মধ্যেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। এ প্রসঙ্গে *ঋক্‌বেদে* বর্ণিত দশরাজার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যুদ্ধ সর্বভারতীয় যুদ্ধে পরিণত হয়। অনার্যরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় ভরত বংশীয় রাজা ছিলেন সুদাস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সুদাসের প্রধান পুরোহিত ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। কিন্তু সুদান ঋষি বশিষ্ঠের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সুদাসের বিপক্ষ দলের রাজাদের সঙ্গে যোগদান করেন। শুরু হয় দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। সুদাস তার শত্রুদের আবারও পরাজিত করেন। নেমে আসে ঘোর দুর্দিন, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অরাজকতা। এ অবস্থায় রণক্লান্ত বিধ্বস্ত রাজারা কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুদাসের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হলেন।[৩৪৩]

বৈদিক যুগে গুপ্তচর বৃত্তি কূটনীতির এক প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করা হতো। কালক্রমে রাজার শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি শাসনব্যবস্থার সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তবে রাজকার্য পরিচালনায় রাজা পুরোহিত শ্রেণি এবং জনমত উপেক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু অথর্ববেদে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য রাজাকে কূটকৌশল, এমনকি প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।[৩৪৪] রামায়ণে কূটনীতি প্রয়োগের চারটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, যথা, সাম (conciliation), দান (gift), ভেদ (dissension) এবং দণ্ড (war)। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা বিধেয়। প্রতিপক্ষকে সাম, দান, ভেদ নীতি দ্বারা বশ করতে না পারলে যুদ্ধই অবশ্যম্ভাবী। বিভীষণ প্রথমেই রামকে লঙ্কাধিপতি রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি গ্রহণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সাম, দান ও ভেদনীতি ব্যর্থ হওয়ায় রাম যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। রামায়ণের কাহিনি থেকে প্রমাণিত হয় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কূটনীতি প্রয়োগ করা হতো।

---

* '...this identity of composition of specimens from Harappa and Knossos can mean only one thing; that they were derived from the same source. Also that Sumer was not implicated other than possibly having acted as a trade route ever which the beads were passed.'[৩৪৫]

মহাভারতের যুগে কূটনীতি রাজনীতির বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। আদিপর্বে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কণিক নামক এক কূটনীতিবিদের কথোপকথন আছে। কণিক সম্ভবত অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত কণিক ভরদ্বাজ। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, রাজশক্তির প্রধান উৎস ক্ষমতা। রাজার উচিত নিজের দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন রেখে শত্রুর দুর্বলতার ওপর সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা। শত্রুপক্ষের কাছে সর্বদাই ক্ষমতার বড়াই করে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতে হবে। পরাজিত শত্রুর কাকুতি মিনতিতে অভিভূত না হয়ে তাকে হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়।

আদিপর্বে সাম, দান, ভেদ নীতি দ্বারা শত্রুকে বশ করার চেষ্টার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। অর্জুন গুহ্যকদের সাম নীতি দ্বারা বশীভূত করেছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে সাম নীতি দ্বারা পাণ্ডবপক্ষে আনয়নের চেষ্টা করেন। এরপর তিনি দান প্রয়োগ করেন। কৃষ্ণ কর্ণকে বলেন, তিনি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিলে তিনিই সিংহাসন লাভ করবেন। কর্ণ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে শ্রীকৃষ্ণ ভেদনীতি প্রয়োগ করে বলেন, যে কৌরবরা কখনো তাকে পাণ্ডবদের মতো সম্মান প্রদর্শন করবে না। এ সব কথা শুনেও কর্ণ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৌরব শিবিরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাবের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হল। এরপর শ্রীকৃষ্ণ কৌরব পক্ষের বেশ কিছু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাণ্ডবদের দুর্জয় পরাক্রমের কথা ব্যক্ত করেন। ঐ রাজাদের পাণ্ডব পক্ষে আনয়নের জন্য নিজের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তারা পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হলেন না। এবার কৃষ্ণ দুর্যোধনের কাছে সমস্ত রাজ্যের বিনিময়ে পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দুর্যোধন কোনো কথায় কর্ণপাত না করায় শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

কণিক, নারদ প্রমুখ বিশিষ্ট কূটনীতিবিদগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজাদের নীতি-বিহর্গিত কাজের পরামর্শ দিয়েছেন। কণিক বলেছেন, ছলে, বলে, কৌশলে শত্রুকে ধ্বংস করাই বাঞ্ছনীয়। বন্ধু, নিকট আত্মীয় এমনকি পিতা, পুত্রও যদি শত্রুতে পরিণত হয় তাহলে রাজা প্রথমে জাদুমন্ত্র, মূল্যবান উপহার দানে, অথবা প্রতারণা এবং মিথ্যাচার দিয়ে বশে আনার চেষ্টা করবেন। এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হলে বিষপ্রয়োগ করে শত্রুকে হত্যা করা কোনো নিন্দনীয় অপরাধ নয়। সাম, দান, ভেদ নীতি দ্বারা শত্রুকে জয় করার জন্য কণিক দূতবেশী মিষ্টভাষী চর নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

নারদ কূটনীতি প্রয়োগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা বাকপটুতা, যে কোনো পরিস্থিতিকে সাহায্য দানের ক্ষমতা, প্রখর বুদ্ধি ও তৎপরতা, স্মৃতিশক্তি এবং সম্যক রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতা। পরিস্থিতি বুঝে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি স্থাপনের জন্য এ সব গুণগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাভারতে পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অর্জনের কয়েকটি কৌশলের কথা বলা হয়েছে, যথা সন্ধি (treaty or alliance), বিগ্রহ (war), যান বা যাত্রা (march against a weak king),

আসন (maintaining a post against enemy), বিপদের সম্ভাবনায় পশ্চাদপসরণ, সংশ্রয় (taking shelter under a superior king) এবং দ্বৈধীভাব (taking recourse to a dual policy)।[৩৪৫]

পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আরও উন্নত মানের কূটনীতির উল্লেখ পাই। এই সময় বিদেশি দূতদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো হতো। বৈবাহিক সম্পর্কের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা দূত বিনিময়ের প্রাচীন ধারা বজায় রেখেছিলেন। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করা ছাড়াও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে রাজারা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজ্যসম্প্রসারণ করতেন।

স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ রাজ্যশাসন প্রণালী ও কূটনীতিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। একবার নৃপতি অজাতশত্রু বজ্জি (বৃজি) রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। এ সম্পর্কে বুদ্ধের মতামত জানবার জন্য তিনি মন্ত্রী ভাস্করকে তার কাছে পাঠান। ইতিপূর্বে বুদ্ধ ধর্ম প্রচারকালে রাজ্যশাসন করার জন্য সাতটি অনুশাসন প্রচার করেন, যথা,

১। নিয়মিত জনমত গঠনের জন্য জনসভার আহ্বান

২। সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐক্যমতের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গঠন

৩। প্রাচীন ঐতিহ্য ও আইন কানুনের প্রতি আনুগত্য

৪। নারীর যথাযথ মর্যাদা দান

৫। পবিত্র স্থানগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

৬। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঐক্য স্থাপন

৭। আহতদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ।[৩৪৬]

বুদ্ধ তার শিষ্য আনন্দ মারফৎ জানতে পারলেন যে বজ্জি শাসক ধর্মের সমস্ত অনুশাসন মেনে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। সতর্ক, সদাজাগ্রত প্রহরীরা রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত। বুদ্ধ মগধাধিপতি বিম্বিসারের মন্ত্রী ভাস্করকে বললেন, ন্যায়ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বজ্জি রাজ্যকে এভাবে গ্রাস করা সম্ভব নয়। ভাস্করের পরামর্শে অজাতশত্রু যুদ্ধের পরিবর্তে ভেদনীতি প্রয়োগ করে বজ্জিদের ঐক্য বিনষ্ট করে রাজ্যটি গ্রাস করলেন। রাজনীতিতে সাফল্য লাভের জন্য বুদ্ধ ভেদ নীতিকে সমর্থন করেন। তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটি আঁতাত গড়ে উঠেছিল। এই আঁতাত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি আদর্শ নিদর্শন।

নবম শতাব্দীতে *আদিপুরাণ* গ্রন্থে জিনসেন দূতের উল্লেখ করেন। গন্ধিল রাজ্যের রাজা মহাবল বিদেশি দূতদের সাদরে গ্রহণ করতেন এবং মহার্ঘ্য উপহার বিনিময় হতো।[৩৪৭]

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কূটনীতিকে 'ন্যায়' আখ্যা দিয়েছেন।* তিনি বলেন কূটনীতিতে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী রাজা পৃথিবী জয়ে সমর্থ। কৌটিল্য তাঁর পূর্ববর্তী রাজনীতিবিদদের

---

* 'Nayajna prithivi jayati' which means a king well-versed in a diplomacy is sure to conquer the world.[৩৪৮]

মতো কূটনীতির ছয়টি বৈশিষ্ট্য সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সংশ্রয় এবং সাম, দান, ভেদ দণ্ড এই চারটি কৌশলের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। আপেক্ষিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিজিগীষু, অরি, মধ্যম ও উদাসীন রাজ্যগুলির মধ্যে শেষোক্ত রাজ্যটির ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। উদাসীন রাজ্যের পরেই মধ্যম রাজ্যটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধরত দেশগুলি থেকে উদাসীন রাজ্য অনেক দূরে অবস্থিত, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ। উদাসীন এবং মধ্যম রাজ্য কখনো এককভাবে অথবা জোটবদ্ধভাবে বিবদমান রাজ্যগুলিকে সাহায্য করত। এদের হস্তক্ষেপে অনেকসময় বিজিগীষু এবং অরিরাজ্য যুদ্ধের পথ পরিহার করত।[৪৯]

ধর্মশাস্ত্রে মনু কূটনীতিকে রাজ্যশাসনের প্রধান অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তার মতে কূটনীতির সফল প্রয়োগে একজন রাজা তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন। রাজা সিংহের মতো শক্তি ও ব্যাঘ্রের মতো বীরত্ব প্রদর্শন করবেন। অসহায় অবস্থায় তার আচরণ হবে খরগোশের মতো। রাজকে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন ও বৈদেশিক অনুপ্রবেশ এবং আগ্রাসন প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে। মনুর মতে কূটনীতির সাফল্য দূতের ওপর নির্ভর করে। মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন, প্রয়োজনে ভেদনীতির বীজ বপনের হাতিয়ার একমাত্র দূত। সেনানায়কের ওপর সৈন্যবাহিনীর সাফল্য, প্রজাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সাম্যরক্ষায় সৈন্যবাহিনী, শাসনকার্য পরিচালনায় রাজা, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি রক্ষায় দূতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[৫০]

মনু, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এবং সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, মাত্রা, দ্বৈধিভাব ও সংশ্রয় প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ও অবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। মনু বলেছেন, দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজিগীষু রাজা একক বা জোটবদ্ধ হয়ে যুদ্ধযাত্রা করবেন। দুর্বল রাজা একক বা মিত্ররাজ্যের সঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধ প্রতিহত করতে সচেষ্ট হবেন। শত্রুসৈন্যের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করাকেও কূটনীতির এক প্রধান অঙ্গ বলে মনু মনে করেন। তিনি আরও বলেন, কোনো রাজা পরাক্রমশালী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্য শক্তিশালী, উদার ও ধার্মিক মিত্র রাজার আশ্রয় গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রজোট গঠন কূটনীতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু শক্তিশালী নয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সৎ এবং প্রজার মঙ্গল সাধনে প্রয়াসী রাজাদেরও মনু জোটবদ্ধ হবার পরামর্শ দিয়েছেন।[৫১]

কালের অগ্রগতির সঙ্গে কূটনীতির ক্রমবিকাশ ও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে আরও বেশি করে রাজ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অভিজাত, বাকপটু, বুদ্ধিমান নরনারীকে কূটনৈতিক বার্তা প্রেরণের নিযুক্ত করা হতো। দূতদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ ছিল— বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত দূত, সাধারণ দূত এবং রাজকীয় দূত।

কোনো রাজ্যে প্রেরিত হবার আগে দূতকে সেই রাজ্যের সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে হতো। পররাজ্যে অবস্থানকালে দূত বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। কিন্তু ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করলে দূতকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। *দেবীপুরাণ* থেকে জানা যায় কার্তিকেয়র

দূত নারদ যুদ্ধবার্তা নিয়ে তারকাসুরের কাছে উপস্থিত হলেন। নারদের কটুকথায় বিক্ষুব্ধ তারকাসুর তাকে দূতের মর্যাদা না দিয়ে বিতাড়িত করলেন। মহিষাসুরের দূতকে দেবী দুর্গা অপমান করলে ক্রুদ্ধ মহিষাসুর দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দেবীর হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু ঘটে।

পৌরাণিক যুগেও সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, আসন, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব, সন্ধি, বিগ্রহ ইত্যাদি কূটনীতির প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হতো। *বিষ্ণুপুরাণ* থেকে জানা যায় পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের কাছে দূত মারফৎ যুদ্ধবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে কূটনীতির আরও বেশি করে মূল্যায়ন হতে থাকে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কালে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু রাজ্যের রাজা আত্মসমর্পণের জন্য গ্রিক শিবিরে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিছু উপজাতীয় রাজ্য গ্রিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হওয়ায় ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি রাজ্যগুলির নায়করা দূত মারফৎ আলেকজান্ডারের কাছে শান্তিপ্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।*

মৌর্যযুগে কূটনীতি আরও উন্নত হয়। বিদেশি দূতরা মৌর্য দরবারে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হতেন। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব একটি বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হয়। গুপ্তযুগেও এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্ত বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই উদ্দেশ্যে বাকাটক রাজা ২য় রুদ্রসেনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজে নাগবংশীয় রাজকন্যা কুবেরনাগকে বিবাহ করেছিলেন এবং কন্যা প্রভাবতীকে দাক্ষিণাত্যের রাজা রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন।

এই প্রসঙ্গে Dr. Smith-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'Chandragupta II adopted a prudent precaution in giving his daughter to the Vakataka prince securing his subordinate alliance.'

বৈদিক যুগে যে কূটনীতির সূচনা হয় তা ক্রমশ বিকশিত হয়ে উত্তরকালে এক সুসংহত রূপ ধারণ করে এবং রাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দূত

কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Ambassador)-কে প্রাচীন ভারতে দূত বলা হতো। আধুনিক কালে দূতকে আইন দ্বারা সুরক্ষিত পদমর্যাদা সম্পন্ন চর বলা যেতে পারে। *কামসূত্র* গ্রন্থে বাৎস্যায়ন দূতকে প্রকাশ চার বলে বর্ণনা করেন। দূত এবং চার উভয়েই বিদেশি রাষ্ট্রে অবস্থানকালে ঐ রাষ্ট্রের গোপন খবর সংগ্রহ করেন, তবে চার-এর কাজ আরও দুরূহ কারণ তাকে সব কাজ গোপনে করতে হয়।[৩৫৩] *অগ্নিপুরাণে* দূতকে বলা হয়েছে

---

* '...from the oxydrakai (Ksuclraka) the leading men of their cities and their provincial governors, besides 150 men of their most eminent men were entrusted with the full powers to conclude the treaty.'[৩৫২]

ছদ্মবেশী চর।[৫৪] লক্ষ্মীধরের *যুক্তিকল্পতরু*-তে এই একই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে দূত যে সম্মান লাভ করে গুপ্তচরের ক্ষেত্রে তা কখনো প্রযোজ্য নয়। গুপ্তচর ধরা পড়লে তাকে কঠোর শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। কূটনৈতিক সম্পর্ক সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য দূতের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে কারণে দূতের বিশেষ কতগুলি গুণ থাকা দরকার। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার ডেভিড কেলগ্ বলেন, একজন রাষ্ট্রদূতের কূটনৈতিক জ্ঞান, পরিমিতিবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৌজন্যবোধ থাকা দরকার। যে রাষ্ট্রে দূত অবস্থান করেন সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

বৈদিক যুগে প্রথম পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে 'সূত' বলা হতো। সূতকেই পরবর্তী কালে দূত নামে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক কালের কূটনৈতিক প্রতিনিধির মতো প্রাহিত নামের দূতের উল্লেখ তৈত্তিরিয় সংহিতায় পাওয়া যায়। প্রাহিত সাধারণত শত্রুর সামরিক শক্তি ও কৌশল সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হতো।[৫৫]

রামায়ণে তিন শ্রেণির দূতের কথা বলা হয়েছে, যথা, পুরুষোত্তম, মধ্যমনর ও পুরুষোধম। পুরুষোত্তমের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। তিনি রাজার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাকে বহন করতে হতো। মধ্যমনর নির্দিষ্ট একটি মিশনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তার ক্ষমতা ছিল সীমিত। পুরুষোধম ছিলেন আধুনিক কালের ক্যুরিয়ারের মতো বার্তাবাহক। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামণ্ডকের নীতিসার এবং সোমদেব সুরির *নীতিবাক্য* গ্রন্থে এই তিন শ্রেণির দূতের কথা আছে। *নীতিবাক্য*-তে এদের বলা হয়েছে, যথাক্রমে নিসৃষ্টার্থ, পরিমিতার্থ এবং শাসনর্হার।

নিসৃষ্টার্থ দূত মন্ত্রীর পদমর্যাদায় পেতেন। রাজ্যের স্বার্থে সম্পূর্ণ বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হতো। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এ ধরনের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজদূত। পাণ্ডবদের তরফ থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ কৌরব শিবিরে নিসৃষ্টার্থ দূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মধ্যমনর এবং পুরুষোধমের মতো ছিল পরিমিতার্থ শাসনর্হার দূতের কার্যাবলি। মহাভারতে শাসনর্হার দূতের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা দ্রুপদ শাসনর্হার দূত হিসেবে পুরোহিতকে কৌরব শিবিরে পাঠিয়েছিলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের কাছে উলুক এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কাছে সঞ্জয়কে আজ্ঞাবাহক করে প্রেরণ করেন। রামায়ণ থেকে জানা যায় রামের দূত অঙ্গদ রাবণের কাছে প্রভুর বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইসব দূত শাসনর্হার দূত শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত।

দূত এবং গুপ্তচর ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। Dr. Mackay-র মতে সিন্ধু সভ্যতার যুগে সুমের, ইলাম প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এ ছাড়া ছিল মিশর, ক্রিট, উর ও কুশ। রাষ্ট্রদূত সম্পর্কিত আধিকারিকরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থরক্ষায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিতেন, বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) বাণিজ্য

সংক্রান্ত লেনদেন ও মাশুলের পরিমাণ নির্ধারণ করতেন। বিদেশি বাণিজ্যে নিয়োগ, আমদানি রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণ, জল ও স্থলপথের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন বাণিজ্য তত্ত্বাবধায়ক। মৌর্যযুগে বাণিজ্য আধিকারিক আমদানি, রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

যে কোনো দেশে দূতের বুদ্ধি, বাগ্মিতা, পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদির ওপর কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে।* প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত Sir David Kellog বলেছেন, 'The essential qulalities of a good diplomat are common sense, good manners, understanding of foreign mentalities and precision of experience.'[৩৫৭]

সর্বাধুনিক কালের মতো প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিবিদগণ দূতের কতগুলি নির্দিষ্ট গুণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম দূতের কতগুলি গুণের ওপর জোর দেন, যথা, বিশ্বস্ততা, কূটনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং ভূগোল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান, প্রতিকূলতার মধ্যে স্থির থেকে কাজ করার ক্ষমতা, আভিজাত্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা ইত্যাদি। উদ্যোগ পর্বে বাসুদেব রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, তিনি যেন উচ্চবংশোদ্ভূত, ধার্মিক এবং নির্ভীক দূতের মাধ্যমে দুর্যোধনের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ দাবি করেন।

বিদেশের সঙ্গে বিভিন্ন কূটনৈতিক বিষয়ে আলাপ আলোচনায় দূতের মুখ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বভাবতই দূতের দৈহিক সৌন্দর্য এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। পনির রাজসভায় দেবতাদের দূত সরমা উপস্থিত ছিলেন। সুন্দরী সরমার রূপে আকৃষ্ট পনি তাকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করতে সচেষ্ট হন। রাবণের কাছে প্রেরিত রামের দূত অঙ্গদ, কৌরব রাজসভায় পাণ্ডব প্রেরিত দূত কৃষ্ণ ছিলেন সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, *মানবধর্মশাস্ত্র*, *শুক্রনীতিসার* গ্রন্থে দূতের দৈহিক সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দূতের আর একটি বৈশিষ্ট্য সুস্বাস্থ্য (Sound health and physical fitness)। *ঋক্‌বেদে* বর্ণিত দূত অগ্নি, রামায়ণের হনুমান ও অঙ্গদ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

দূতকে হতে হবে স্থিতপ্রজ্ঞ, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা ও দ্বিধা থাকবে না। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জটিল সমস্যা সমাধানে তাকে দক্ষ হতে হবে। *ঋক্‌বেদে* ইন্দ্রের দূত সরমা সাহসিকতার সঙ্গে পনি প্রদত্ত উৎকোচ গ্রহণে অস্বীকার করেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সমীপে নির্ভীক হনুমান ও অঙ্গদ প্রভু রামের বার্তা নিবেদন করেছিলেন। রাবণের অনুচররা হনুমানকে বন্দি করে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত করল। দুর্জয় সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হনুমান অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ঐ

---

* 'The ambassador sent to represent the king at foreign courts should be a man of very sharp intellect, sweet mouthed, possessing eloquence of speech and well-versed in the art of diplomacy.'[৩৫৬]

অবস্থার মোকাবিলা করতে সমর্থ হন। পাণ্ডবপক্ষ থেকে কৌরব দরবারে দৌত্য করতে এসে কৃষ্ণ সহজেই পরিস্থিতি বুঝে গেলেন। দুর্যোধনের কৃষ্ণকে বন্দি করার ষড়যন্ত্রও তার অজানা ছিল না। দুর্জয় সাহস এবং অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা কৃষ্ণ দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন।

বাগ্মিতা দূতের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। 'It is the art, power and practice of uttering strong emotion in correct appropriate expressive and fluent language.'[৩৫৮] মধুর বাক্যালংকারে যে কোনো ব্যক্তিকে মুগ্ধ করা যায়। বিদেশিকে সপক্ষে আনয়ন করার জন্য এ গুণটির দরকার। প্রাচীন ভারতে দূত নিয়োগ করলে তার বাগ্মিতার ওপর লক্ষ রাখা হতো। অগ্নি, অঙ্গদ, সরমা— এরা সকলেই ছিলেন সুবক্তা। সর্বকালে, সর্বজনপূজ্য কৃষ্ণ ছিলেন সর্বগুণের অধিকারী। রাজনীতিবিদ, দার্শনিক কৃষ্ণ বিস্ময়কর বাগ্মী ছিলেন। সুচতুর কৃষ্ণ মধুর বাক্যালংকার প্রয়োগে ছিলেন অতুলনীয়।

দূতের আর একটি বিশেষ গুণ সৌজন্যবোধ। Harold Nicolson কূটনৈতিক প্রতিনিধির সৌজন্য বোধ একটি বিশেষ গুণ বলে বর্ণনা করেছেন।* প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য *ঋক্‌বেদ*, মহাকাব্য *রামায়ণ মহাভারত* এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে দূত নিযুক্তকালে তার সৌজন্যবোধের উপর বিশেষ লক্ষ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন দূত সমস্ত বিষয় অনুধাবন করে আন্তঃরাষ্ট্রীয় আলোচনায় নিজের দেশের বক্তব্য ও সমস্যা সঠিকভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। *রামায়ণে* অঙ্গদ এবং হনুমান রামের বক্তব্য রাবণের কাছে সঠিকভাবে পেশ করেছিলেন। *মহাভারত*, মানব ধর্মশাস্ত্র, কামণ্ডক নীতিসার দূতের প্রখর স্মৃতিশক্তির উপর গুরুত্ব দেয়। প্রাচীন ভারতে সাধারণত উচ্চ অভিজাত বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের দূত নিযুক্ত করা হতো।

প্রাচীন ভারতে দৌত্য কার্যে সফলতার জন্য নৈতিক চরিত্রকে প্রধান হাতিয়ার বলে গণ্য করা হতো। বিদেশে অবস্থানকালে দূতকে সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি নারী গুপ্তচরের প্রলোভনে পড়ে যাতে কোনো খবর ফাঁস না করে সেদিকে নজর রাখা দরকার। সরমা, হনুমান, অঙ্গদ প্রায় সকলেই দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ধীশক্তি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা প্রভৃতি গুণ ছিলেন। ধীশক্তি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং সতর্কতা প্রভৃতি গুণ না থাকলে দৌত্য সফল হতে পারে না। বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি বিনিময়কালে দূতকে নিজ দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। মহাভারতে কৃষ্ণের ধীশক্তি এবং অন্যান্য গুণাবলী প্রশ্নাতীত। সঞ্জয় ও বিদুর ছিলেন ধীমান, ধৈর্যশীল এবং বিচক্ষণ। হনুমান শুধু যে বুদ্ধিমান ছিলেন তাই নয়, তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণটি লক্ষণীয়। রাবণ যখন মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তার লেজে অগ্নিসংযোগের নির্দেশ দেন, হনুমান তৎক্ষণাৎ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেন। দুর্যোধন যখন কৃষ্ণকে কটুবাক্যে

---

* 'a diplomat may be truthful, accurate, calm, patient and good tempered, but he is not an ideal diplomatist unless he be modest.'[৩৫৯]

জর্জরিত করে তাকে বন্দি করার ফন্দি আঁটলেন স্থিতপ্রজ্ঞ কৃষ্ণের তখনও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি দূতকে নির্ধারণে সহায়তা করে। অঙ্গদ যখন রামের বার্তা নিয়ে রাবণের দরবারে উপস্থিত হন তখন রাক্ষসাধিপতি তাকে পিতৃহন্তা রামের পক্ষ ত্যাগ করে নিজের দলে নিয়ে আসার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। অঙ্গদ উত্তেজিত না হয়ে রাবণকে বললেন তিনি যদি তার পা ধরে তাকে নড়াতে পারেন তবেই তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। অনেক চেষ্টা করেও রাবণ অঙ্গদকে নড়াতে পারলেন না। কৃষ্ণ বার বার চাতুর্য, উপস্থিত-বুদ্ধি এবং পরিণামদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন।

আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন ভারতে দূতরা যে-সব রাষ্ট্রে দৌত্য কার্যে নিযুক্ত হতেন সে-সব দেশের ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ঐ সব দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তথ্য দূতের জানা দরকার বলে মনে করা হতো। Harold Nicolson-এর মতে, 'An ambassador must be good linguist...' মানবধর্মশাস্ত্র এবং শুক্রনীতিসারের মতে বিভিন্ন শাস্ত্র এবং সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে দূতের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনে দূতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার দূতের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, বিচ্ছেদ ও বিভ্রান্তি সামগ্রিকভাবে বাতাবরণকে অশান্ত করে তোলে। স্বদেশের প্রতি দূতের অকুণ্ঠ আনুগত্যের বিষয়টি মানবধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে বলা হয়েছে কর্তব্যে অবহেলা এবং আনুগত্যের অভাব দূতের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ। কৌটিল্য বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দূত তার প্রভুর বার্তা সঠিকভাবে জানাতে যদি ভয় পায় তবে তার মৃত্যুদণ্ড বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন ভারতে বিদেশি দূতদের রাজদরবারে সাড়ম্বরে গ্রহণ করা হতো। বিদেশি দূত সম্মানিত অতিথির মর্যাদা লাভ করতেন। দূত ছিলেন অবধ্য। *রামায়ণ, মহাভারতে* বলা হয়েছে দূত একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে তার প্রভুর বার্তার নিবেদক। সেজন্য তাকে হত্যা করা অপরাধ। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম দূত হত্যাকে ভ্রূণহত্যার মতো অপরাধ বলে গণ্য করেন।* বৈশম্পায়নের মতে, 'an ambassador is no to be put to death even if he commits a grievious wrong.' নীতিবাক্য শাস্ত্রে এই একই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। শুক্রনীতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চন্দ্রেশ্বর বলেন, দূত একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, মুখপাত্র। সে দুর্বিনীত এবং শস্ত্রধারী হলেও অবধ্য।

---

* 'He alone brings in peace or breaks the peace and makes a cleavage among the subjects of the country.' *Politics and Ethics in Ancient India*, Manorama Jauhuri, 218, Vide, Ramayana Vidyalankar Chandragomin 5.2.2.' The ambassador who is simply the nouthpiece of his master should not be murdered because it is against public and political morality.'[৩৬০]

ঐতিহাসিক যুগে বিদেশাগত কূটনীতিবিদগণ যথেষ্ট আদৃত হতেন। তাদের বাক্‌স্বাধীনতা ছিল এবং তারা ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতেন। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল সুরক্ষিত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসকে বাক্ স্বাধীনতা ছাড়াও অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (extra-territorial right) দিয়ে ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে মেগাস্থিনিস এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারেন। ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি *ইণ্ডিকা* গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এই বইটি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উপাদান। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে মিশরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফাস-এর দূত ডাইয়োনিসিয়াস ভারতে আসেন। তবে তিনি বিন্দুসার বা অশোকের রাজসভায় এসেছিলেন কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের উত্তরসূরি ডিমাকোস বিন্দুসারের রাজসভায় অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধনের আমলে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে আসেন। হর্ষবর্ধন তাকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেন।[৩১] তিনি হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেন। একবার ভিন্ন মতাবলম্বী বিপক্ষ দলের হাতে হিউয়েন সাং-এর জীবন সংশয় হয়। হর্ষবর্ধন সর্বতোভাবে এই সম্মানিত অতিথিকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউয়েন সাং ভারতে অবস্থান করে বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তু, বারাণসী, গয়া, দক্ষিণ ভারতে পশ্চিমঘাট এবং আরও অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। হিউয়েন সাং বেশ কিছু সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। হিউয়েন সাং-এর *ভারত বিবরণ* প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে এক মূল্যবান গ্রন্থ। Dr. R K Mookherjee বলেন, 'the account of India left to us by Hiuen-Tsang reads like a Gazetter in the scope of its enquiry and its wealth of details.'[৩২] হিউয়েন সাং-এর কাছে চীন সম্রাটের শৌর্য বীর্যের কাহিনি শুনে হর্ষবর্ধন চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধন চীন সম্রাটের দরবারে একজন ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে চীনের দূত হর্ষবর্ধনের সভায় উপস্থিত হন। ঐ বছরই দ্বিতীয় দফায় চীনা দূত লি-পিয়াও এবং ওয়াং-হুয়ান-সি ভারতে আসেন। হর্ষবর্ধন অত্যন্ত সমাদরে তাদের গ্রহণ করেছিলেন।

দূত প্রধানত দৈহিক শাস্তি, অপমান এবং মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির আওতার বাইরে থাকতেন। তবে দূতের অপমান এবং হত্যার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। রামায়ণে রামের দূত হনুমান এবং মহাভারতে পাণ্ডবপক্ষের দূত শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিলেন। রাবণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অত্যাচার অনাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তার কাছে যে দূত পাঠিয়েছিলেন রাবণ তাকে হত্যা করেন।

দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় চোলরাজ রাজরাজের

(৯৮৬ খ্রি.) দূত মালাইনাড়ুর অষ্টাদশ রাজপুত্রের এক সংঘ দ্বারা অপমানিত হন। ক্রুদ্ধ রাজরাজ মালাইনাড়ু আক্রমণ করে ঐ রাজপুত্রদের পরাজিত ও নিহত করেন।

আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে দূতকে অপমান করার অজস্র নজির পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। ভারত আক্রমণ কালে গজনির অধিপতি সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। মন্দির থেকে লুণ্ঠিত অপরিমেয় ধনসম্পদের সঙ্গে সোমনাথের মূর্তিটি স্বদেশে নিয়ে যান। মসজিদে যাবার রাস্তায় মূর্তিটিকে পদদলিত করার জন্য ফেলে রাখা হয়। এই ঘটনা শুনে হিন্দুরা দূত মারফৎ মূর্তির ওজনের দ্বিগুণ সোনা দিয়ে মূর্তিটি ফেরৎ চান। সুলতান উপহার গ্রহণ করে ঐ দূতদের সালার মাসুদের কাছে প্রেরণ করেন। মাসুদ সুরভিত চন্দনের আতর তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে সুস্বাদু পান দিয়ে আপ্যায়ন করেন। মুগ্ধ দূতেরা ঐ মূর্তিটি ফেরৎ চাইলে মাসুদ বলেন ঐ মূর্তি গুঁড়ো করে চুন ও সুপুরির সাথে মিশিয়ে তাদের পান তৈরি করা হয়েছে। 'Such an instance of insult to envoys is seldom found.'[৩৬৩]

সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তির সময়কাল থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূতের ব্যবহারের কথা জানা যায়। শুধু তাই নয়, সুদূর অতীতে গোষ্ঠীসংঘাতের সময় উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ অথবা শান্তিপ্রস্তাব নিয়ে দূত বিনিময় হতো। দূত শুধু বার্তাবাহক নয়, বিদেশে অবস্থানকালে চর মারফৎ দূত ঐ দেশের গোপন খবর সংগ্রহ করে। দুটি দেশের স্বার্থরক্ষার্থে পারস্পরিক আলোচনা, চুক্তি সম্পাদন, ঐ দেশে বসবাসকারী নিজের দেশের মানুষের সুখ সুবিধা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জটিল সমস্যার সমাধান ইত্যাদি নানা গুরু দায়িত্ব বহন করে দূত।

মনুর মতে, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি অথবা যুদ্ধ এড়াবার জন্য দূত বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে শত্রুর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হবেন। বিদেশে অবস্থানকালে ঐ দেশের শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি ভালো মন্দ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির সহায়তা নিয়ে দূতকে নিজের দেশের স্বার্থরক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হবে। মনু এবং কৌটিল্য শত্রু রাজ্যের খবর সংগ্রহের জন্য দূতকে ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী, চিকিৎসকের ভেকধারী চরদের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখার নির্দেশ দেন। অনেক সময় শত্রুপক্ষের বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এবং আমলাদের সপক্ষে টেনে শত্রুরাজ্যে ভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'উভয় বেতন চার' নিযুক্ত করা হতো। ঐ চারেরা স্বরাষ্ট্র এবং শত্রুরাজ্য উভয়ের কাছ থেকে বেতন লাভ করত। উভয় বেতন চার নিযুক্ত করে দূত অনেক সময় মদমত্ত ব্যক্তি, উন্মাদ, ভিক্ষুক, ঘুমন্ত ব্যক্তির অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে অনেক অজানা গোপন খবর সংগ্রহ করতেন। দূত এবং চর উভয়কে সাংকেতিক ভাষা (code language) এবং গূঢ়লেখ (secret language or symbol) সঠিক বোঝার দক্ষতা অর্জন করতে হতো। শত্রুরাজ্যে অবস্থিত দূত-এর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে রাজা একই সঙ্গে শত্রু প্রেরিত দূতের

ওপর সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কামণ্ডকের মতে শত্রুর সামরিক শক্তি, ঘাঁটি, ধন ঐশ্বর্যের উৎস এবং পরিমাণ, খনিজ সম্পদ, দুর্গ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে সমস্ত খবর দূত নিজে অথবা চর মারফৎ সংগ্রহ করবে।

কৌটিল্যের মতে বিদেশি রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ করার আগে তাকে সৌজন্যমূলক আচরণ বিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। বিদেশে অবস্থানকালে দূত বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তি, নিরাপত্তারক্ষী, বনসংরক্ষণ অধিকর্তা, সীমান্তরক্ষী এবং রাজকর্মচারীদের মন জয় করতে প্রয়াসী হবেন। শত্রুরাজ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করা নিরাপদ নয়। কার্যসিদ্ধি হলে দূত ঐ রাজ্যের রাজার অনুমতি নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন শত্রুর আতিথেয়তা এবং সম্মান প্রদর্শনে বিমোহিত হয়ে দূত সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবেন না। পক্ষান্তরে শত্রুর রুষ্ট আচরণে তিনি উষ্মা প্রদর্শন করবেন না। দূতকে নারী ও সুরাসক্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। অনেক সময় ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায়। সে কারণে দূতকে নিভৃত শয়নকক্ষ বেছে নিতে হবে। দূতকে নির্ভীক হতে হবে। নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন হলেও প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার বার্তা পেশ করতে হবে। যদি শত্রু রাজ বিপক্ষের দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন, ধৈর্য ধরে তার কথা শোনেন, কুশল বিনিময় করেন, সম্মানিত আসন দেন এবং নৈশভোজ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান তাহলে দূত শত্রু রাজার সদিচ্ছাকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। অন্যথা হলে শত্রুভাবাপন্ন রাজাকে দূত স্মরণ করিয়ে দেবেন যে তিনি তার প্রভুর মুখপাত্র (mouthpiece)।

যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিপ্রস্তাব, যুদ্ধের সময় মিত্ররাজ্যে সাহায্য প্রার্থনা করে দূত প্রেরণের প্রথা অতীতকাল থেকে চলে আসছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে পাণ্ডবরা সাহায্য ও বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে ভাগদত্ত (estern coast), হার্দিক্য, চেদিরাজ সুবাহু, পৌরব, শক, পল্লব এবং কলিঙ্গ রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন। দ্রোণ, ভীষ্ম এবং দুর্যোধনের কাছে দ্রুপদ রাজা সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ দূত পাঠিয়েছিলেন। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন দূত হিসেবে গিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ গণরাজ্যগুলিতে দূত শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে কেন্দ্রীয় সভা পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিল। বিদেশি দূত ও রাজকুমারদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সভার হাতে। পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় সভার স্বল্পসংখ্যক সদস্যকে দূত হিসেবে প্রতিপক্ষের কাছে পাঠানো হতো। সাধারণত যুদ্ধকালে এরূপ জটিলতার সৃষ্টি হতো। ক্ষুদ্রক নামে বৌদ্ধ গণরাজ্যের দূত আলেকজান্ডারের কাছে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈদেশিক নীতির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তা সাধারণ সভায় আলোচনা হতো না। অল্পসংখ্যক গণরাজ্য পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা লাভ করে। অধিকাংশ গণরাজ্যের গোপন নীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।[৩৩] *বৌদ্ধজাতক* গ্রন্থ থেকে জানা যায় অনেক সময় দূতের মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করা হতো। অষ্টরূপ জাতকে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র

বোধিসত্ত্ব দূত মারফৎ কোশলরাজকে যুদ্ধের চরম বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কোশলরাজ কাশীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এক দূতের মাধ্যমে 'হয় বশ্যতা নয় যুদ্ধ' প্রস্তাব দেন। দূতের মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি প্রস্তাব পাঠানোর চিরাচরিত প্রথাটি বৌদ্ধ এবং পরবর্তী যুগেও বহাল থেকে যায়। মগধের বৌদ্ধ নৃপতি বিম্বিসারের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। গান্ধাররাজ পুককুসৌতি পাঞ্জাবে অবস্থিত শাকলের 'পাণ্ডব' নামক এক জাতির দ্বারা আক্রান্ত হলে বিম্বিসারের সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠান। কিন্তু বিম্বিসার অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণে বিব্রত থাকায় গান্ধাররাজকে সাহায্য করতে পারেননি।[৩৬৫]

সুপ্রাচীন কালে 'সুত' নামক কর্মচারী পরবর্তীকালে দূত নামে অভিহিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পৌরাণিক, সুত এবং মাগধ নামক এক শ্রেণির জনসংযোগকারী (publicity officers) উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা উচ্চ বেতন পেতেন এবং রাজসভায় এদের পৃথক মর্যাদা ছিল। এই রাজকর্মচারীরা জনসমক্ষে নিজেদের রাজার শৌর্য বীর্যের কাহিনি প্রচার করে বেড়াতেন। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধে এদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কালক্রমে এ ধরনের রাজকর্মচারীর অবস্থার অবনতি হয় এবং এই পদগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বিভিন্ন লিপি এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ *মহাবংশ* থেকে জানা যায় সিংহলের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। কথিত আছে খ্রি. পূ. ৫৪৩ অব্দে উত্তর ভারতের এক রাজপুত্র বিজয় পিতৃরাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে ৭০০ সৈন্যসহ মগধের দক্ষিণাঞ্চল থেকে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। সিংহল দ্বীপের সক্ষদের পরাজিত করে তিনি ঐ অঞ্চল দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

পারস্য ও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। গ্রিস ও পারস্যের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত দূত বিনিময় হতো। পারসিক সম্রাট সাইরাসের রাজসভায় জনৈক ভারতীয় নৃপতি দূত প্রেরণ করেন। Arta Xerexex II Menon (405-358 BC) নামক পারসিক রাজার সভায় গ্রিক চিকিৎসক টেসিয়াসের অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় দূতদের বিবরণের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে ভারতে আগত গ্রিক, সিরিয় ও মিশরীয় দূতগণ পাটলিপুত্র অবস্থানকালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এগুলি ভারত ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।[৩৬৬]

গ্রিক ম্যাসিডোনিয়ান আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের পর থেকে ঐ দেশের সঙ্গে ভারতের দূত বিনিময় আরও নিয়মিত হয়ে ওঠে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

> With the descent of Alexander the great upon the Punjab, a new period indeed had commenced, for India entered far more intimate relations with foreign countries than had hitherto been the case.[৩৬৭]

গ্রিস ও ভারতের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের ফলে ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। কার্টিয়াস রথারোহী মূল্যবান স্বর্ণখচিত আভরণে ভূষিত অভিজাত ভারতীয় দূতদের দেখে মুগ্ধ হন। খ্রি. পূ. বিশ শতকে জনৈক পাণ্ড্যরাজ অগাস্টাস সিজারের দরবারে দূত পাঠান। মালব, ক্ষুদ্রক এবং আরও অনেক গণরাজ্য আলেকজান্ডারের কাছে দূত মারফৎ শান্তি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ফলে ঐ রাজ্যগুলি ধ্বংসাত্মক গ্রিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে বিদেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা এতই বৃদ্ধি পায় যে ভ্রমণকারী এবং দূতদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য একটি পৃথক দপ্তর খোলা হয়। 'Never despise an enemy nor trust a friend'*— এই নীতিকে কেন্দ্র করে চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতো। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দূত ছিলেন সিরিয়ার রাজা সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস, অন্যান্য ভ্রমণকারী ও দূতদের বিবরণ থেকে সমকালীন ভারতবর্ষের নৌবাহযোগ্য নদী, প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ, রাজ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, গুপ্তচর সংস্থা, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানা যায়। বিদেশি রাষ্ট্রে অবস্থানকালে দূতগণ শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহ, বার্তা বিনিময়, যুদ্ধ বা শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হতেন এমন নয়, উভয় দেশের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম, শান্তির সময় একে অপরের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালে গ্রিস ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল। সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিয়োকাসের সঙ্গে বিন্দুসারের হৃদ্যতা ও দূত বিনিময়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। Dyon Crrystom বলেন, ভারতীয় চারণ কবিরা হোমারের কাব্যগাথার অনুবাদ নিজেদের মতো সুর করে গাইতো। ঐতিহাসিক প্লিনির মতে মিশরের রাজা টলেমি ফিলাডেলফাস (২৮৫-২৪৫ খ্রি. পূ.) তাইনোসিয়াস নামক এক দূত বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করেন। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে অক্ষুনদীর অববাহিকা ধরে কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগর দিয়ে ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হতো।

সম্রাট অশোকের দ্বাদশ প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে দূতের বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি দূতদের তিনটি ভাগে ভাগ করেন। নিঃসৃষ্টার্থ (পূর্ণক্ষমতা প্রাপ্ত) পরিমিতার্থ (সীমিত ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং শাসনার্হ (রাজকীয় বার্তা বহনকারী)। সিরিয়ার অধিপতি দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োকাস, পশ্চিম এশিয়ার রাজ্য, দক্ষিণ ভারত, মিশরের অধিপতি টলেমি

---

* 'The accounts of the famous Greek ambassadors like Magasthenes and others are evidences to show that they gathered all the details of India's navigable rivers natural products, cities particularly the capital city of Pataliputra and different executives of the government including spies.' The Hist and Culture of the Indian people Vol III, R. C. Majumdar, A.D. Pusalkar, A. K. Majumdar 353-55.[৩৬৮]

ফিলাডেলফাস, উত্তর আফ্রিকার মেগান, ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি অ্যান্টিগোনে গোনেটাস প্রভৃতির সঙ্গে অশোক কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, সিংহলে অশোকের দূত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু অশোকের অহিংস নীতি গ্রিকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল থেকে অশোক সৈন্য অপসারণ করেছিলেন সেই সুযোগে গ্রিকরা কাবুল, পাঞ্জাব, এমনকি মধ্যদেশ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতিতে ভেরীঘোষ (reverberation of the kettle drum) এর পরিবর্তে অশোকের ধর্মনীতির (Law of piety) তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে অশোকের ধর্মনীতি মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের একটি কারণ।* যাই হোক, অশোকের ধর্মনীতি সিংহলে প্রচারিত হয়। তার দূত মহেন্দ সিংহলরাজ তিস্যা এবং তার প্রজাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। অশোক সংঘমিত্রাকেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল এবং ব্রহ্মদেশে পাঠিয়েছিলেন।

শেষ মৌর্যরাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে তার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ মগধের সিংহাসন দখল করেন। সুঙ্গ বংশীয় রাজারা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুষ্যমিত্রের উত্তরাধিকারী পুত্র অগ্নিমিত্রর রাজত্বকালে মধ্যভারতে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। মধ্যভারতের বিদিশা, ভারহুত প্রভৃতি অঞ্চল সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যাকট্রিয় গ্রিকরা এই সময়ে অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পুষ্যমিত্রর সেনাপতির কাছে পরাজিত হয়ে তারা গাঙ্গেয় সমতল ভূমির শাসকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। অগ্নিমিত্রর উত্তরাধিকারীদের আমলেও গ্রিকদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বেসনগর লিপি থেকে জানা যায় সুঙ্গবংশীয় রাজা কাশিপুত্র ভাগভদ্রের রাজত্বকালে অ্যান্টিয়োলডাসের দূত তক্ষশীলা নিবাসী হেলিওডোরাস তার রাজসভায় আসেন। হেলিওডোরাস ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাসুদেব কৃষ্ণের স্মরণে বেসনগরে একটি গড়ুর স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

রোম ও চীনের সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের যোগাযোগ ছিল। মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে রোমকদের কথা উল্লেখ আছে। অগাস্টাস (২৭-২০ খ্রি. পূ.)-এর আমল থেকে রোমের সঙ্গে ভারতের দূত বিনিময় হতো। ৯৯ খ্রিস্টাব্দে ট্রোজান দরবারে ভারতীয় দূতের উপস্থিতির কথা জানা যায়। *স্ট্রাবো, প্লিনি* এবং *পেরিপ্লাস* গ্রন্থের লেখক ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেন। কুষাণরাজ প্রথম কদ্‌ফিসেস অগাস্টাস, ক্লডিয়াস প্রভৃতি রোমান রাজাদের অনুকরণে মুদ্রা প্রচলন করেন।

কুষাণরাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধমত প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন, জাপান,

---

* 'It has rightly been pointed out that as a result of this change in the foreign policy, a period of stagnation set in the history of India. The Mauryan empire began to dwindle down in extent till it sank to the same position from which it had grown from the time of Bimbisara or Ajatsatru.[৩৬৯]

তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ায় দূত প্রেরণ করেন। সমসাময়িক একটি চীনা বিবৃতি থেকে জানা যায় কুষাণ বংশীয় রাজা পো-টিয়াও (বসুদেব) সাসানিদদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে ২৩০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক চীনা রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন।

গুপ্তযুগে পররাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন সন্ধি বিগ্রহিক (a minister of war and peace— a foreign)।[৭০] এককথায় সন্ধি বিগ্রহিকের কূটনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন ছিল। গুপ্তযুগে সন্ধি বিগ্রহিককে এক অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলে বিবেচনা করা হতো। অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধিবিগ্রহিক রাজার সহগামী হতেন। তিনি কুমার অমাত্য (cadet minister) এবং মহাদণ্ডনায়ক (great commander of the army)-এর দায়িত্ব পালন করতেন।

গুপ্তরাজারা বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত উত্তর পশ্চিমের দৈবীপুত্র সাহি সহানুসাহি, শক মুরাণ্ডা, উত্তরের শক প্রধান, সুরাষ্ট্র এবং মধ্যভারত, সিংহল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।[৭১] সিংহলে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজা ছিলেন মেঘবর্ণ। সিংহলের বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করে তার কাছে দূত প্রেরণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের সম্মতি নিয়ে তিনি বুদ্ধগয়ায় একটি অসাধারণ বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেন।[৭২] গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। তার লেখা 'ফো-কুয়ো-কিং' সমসাময়িক ভারতের ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের উৎকীর্ণ লিপিতে রাজকর্মচারীদের তালিকায় দূতের উল্লেখ করা হয়েছে।

কূটনীতিতে গুপ্তরাজাদের সাফল্য ও অবদান প্রশংসার দাবি রাখে। সমুদ্রগুপ্ত তার যুদ্ধবিজয় নীতি সফল করার জন্য কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার উত্তরাধিকারীরা এই ধারা বজায় রেখে একটি শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করতে সমর্থ হন।

অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিগণ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। বলভীর মৈত্রকদের শাসনব্যবস্থা ছিল সুসংহত। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বলভীর রাজা ছিলেন প্রথম শিলাদিত্য, খরগ্রহ, তৃতীয় ধারাসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন, বালাদিত্য এবং চতুর্থ ধারাসেন। বলভী রাজ্যের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সুসম্পর্ক ছিল না। হর্ষবর্ধন বলভী রাজ্যটি আক্রমণ করলে বন্ধু রাজ্যের সহায়তায় বিপর্যয়ের হাত থেকে বলভী রক্ষা পায়। Dr. R C Majumdar-এর মতে হর্ষবর্ধন বলভী রাজ্য গ্রাস করতে ব্যর্থ হন।[৭৩] বলভী রাজ্যের বিদেশমন্ত্রীকে বলা হতো মহাসন্ধি বিগ্রহক্ষপতততধি-পতি।

কনৌজরাজ হর্ষবধনের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। চীন থেকে আগত বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাং দীর্ঘকাল হর্ষবর্ধনের রাজসভায় অবস্থান করেন। তার সঙ্গে সম্রাটের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হিউয়েন সাং-এর *সি-উই-কি* গ্রন্থ সমকালীন ভারত ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিনি হর্ষবর্ধনের

শাসন ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হিউয়েন সাং ঐ সময় এক শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ করেন। এরা ছিলেন বার্তাবাহক (শাসনার্হ দূত-courier)। এই দূতেরা নিয়মিত রাজ্য পরিক্রমায় নিযুক্ত থাকত। কোথাও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তার কারণ অনুসন্ধান করে সমস্ত খবর সম্রাটের দরবারে পেশ করত। বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণকালে এদের স্বল্পকাল অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল। বর্ষাকালে এদের রাজ্য পরিক্রমা স্থগিত রাখা হতো।[৭৪] হিউয়েন সাং দুর্লভ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। অসাধারণ ছিল তার পর্যবেক্ষণ শক্তি। তিনি ছিলেন সুবক্তা। অত্যন্ত মধুর ছিল তার কণ্ঠস্বর। দূত হিসেবে হিউয়েন সাং-এর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তিনি ভারতের সামগ্রিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে-ভাবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন তাতে তার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়। তার দৃষ্টি ছিল উদার এবং পক্ষপাতশূন্য। হিউয়েন সাং চীন সম্রাটের শৌর্য বীর্য এবং ঐশ্বর্যের চিত্রটি যেভাবে হর্ষবর্ধনের কাছে তুলে ধরেন তাতে সম্রাট চীন সম্রাটের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। হর্ষবর্ধন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে চীনের রাজদরবারে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেন।[৭৫] প্রত্যুত্তরে চীন সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজসভায় চীনা দূত লি-ই-পিয়াও-কে পাঠিয়েছিলেন। লি-ই-পিয়াও হর্ষবর্ধনকে চীন সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণের এক আদেশনামা পেশ করলেন। বিস্মিত হর্ষবর্ধন অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন ইতিপূর্বে এ ধরনের কোনো প্রস্তাবের কথা তিনি শোনেননি। কিন্তু তার এতই সৌজন্যবোধ ছিল যে তিনি চীন সম্রাটের আদেশনামাটি মাথায় তুলে নেন। দ্বিতীয় দফায় চীন থেকে আবার লি-ই-পিয়াও এবং ওয়াং লিয়েন হর্ষবর্ধনের দরবারে উপস্থিত হলেন। এবারও সম্রাট তাদের প্রতি সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন। হিউয়েন সাং-এর সুপারিশে যে ভারতীয় দূতকে চীনে পাঠানো হয়েছিল চীনা দূতরা এবার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

হিউয়েন সাং-এর কাছে হর্ষবর্ধনের ভূয়সী প্রশংসার কথা শুনে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় দফায় চীন সম্রাট ওয়াং-লিয়েন-সি-কে দূত হিসেবে ভারতবর্ষে পাঠালেন।[৭৬] ওয়াং সি লিয়েন ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর চীনের ভারত আক্রমণের একটি বিবরণ দেন। মূল বিবরণটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে মাতোয়ান নামে এক চীনা লেখক লিখেছেন যে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে রাজ্যে ঘোর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে তার মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে নেন। এইসময় চীন ভারত আক্রমণ করে। ঘোরতর যুদ্ধে হর্ষবর্ধনের মন্ত্রী পরাজিত হন। তাকে বন্দি করে চীনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এই কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।[৭৭]

দূতের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়াও নির্দিষ্ট বার্তাবহনকারী দূত নিয়োগ করা হতো। হিউয়েন সাং ভারত ভ্রমণকালে একবার কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মণ-এর রাজসভার উপস্থিত হয়ে অবস্থান করতে লাগালেন। হর্ষবর্ধন ভাস্করবর্মণের কাছে দূত পাঠিয়ে হিউয়েন সাং-কে ফেরৎ চাইলেন। ভাস্করবর্মণ প্রত্যুত্তরে জানালেন তিনি তার

মস্তকের বিনিময়েও মহাজ্ঞানী হিউয়েন সাংকে ফেরৎ দেবেন না। ক্রুদ্ধ হর্ষবর্ধন আবার দূত মারফৎ কামরূপ রাজার শিরশ্ছেদ করার আদেশ পাঠালেন। ভীত সন্ত্রস্ত ভাস্করবর্মণ স্বয়ং হিউয়েন সাং-কে সঙ্গে করে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। হিউয়েন সাং-এর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে ভাস্করবর্মণ নালন্দার অধ্যক্ষ আচার্য শীলভদ্রর কাছে দূত মারফৎ হিউয়েন সাং-কে তার কাছে ফেরৎ দিতে বললেন। শীলভদ্র এই আদেশ অমান্য করায় ভাস্করবর্মণ নালন্দা বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করার চরমপত্র দূত মারফৎ পাঠালেন। বাধ্য হয়ে শীলভদ্র হিউয়েন সাং-কে ভাস্করবর্মণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দক্ষিণ ভারতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। ভারতের বাইরেও তার খ্যাতি ছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে ৬২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে পারসিক সম্রাট দ্বিতীয় খুসরুর দরবারে তিনি দূত প্রেরণ করেছিলেন। অনেকের মতে পুলকেশির সঙ্গে খুসরুর দূত বিনিময়ের ঘটনা অজন্তার ফ্রেসকো চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় নৃপতিগণও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। গাহড়বাল বংশীয় বারাণসীরাজ গোবিন্দচন্দ্র সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন।[৭৮] পূর্বেই বলা হয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সাম্রাজ্য বিস্তার কূটনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। গোবিন্দচন্দ্র মথনদেবের পৌত্রী এবং রামপালের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারদেবীকে বিবাহ করে কিছুদিনের জন্য পাল-গাহড়বাল সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হন। উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সুযোগে গোবিন্দচন্দ্র কীর্তিপালের কাছ থেকে উত্তর সমুদ্র রাজ্য দখল করে নেন। কলচুরী রাজ্যের কিছু অংশ তার দখলে আসে। গাহড়বাল রাজাদের বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ, যোদ্ধা এবং কৃতকল্পতরুর লেখক লক্ষ্মীধর গোবিন্দচন্দ্রের মহাসন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। লক্ষ্মীধর গোবিন্দচন্দ্রকে সাফল্যের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন। তিনি কাশীরাজের শত্রুদের পরাজিত করে তার গৌরব বৃদ্ধি করেন।[৭৯] লক্ষ্মীধর মহাসন্ধিবিগ্রহিককে (minister of war and piece) অমাত্যদের তালিকায় বিশিষ্ট স্থান দেন। লক্ষ্মীধরের মতে মহাসন্ধিবিগ্রহিকের কূটনীতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার।

গাহড়বালদের উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারী ছিলেন দূত। সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় দূত উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত। কূটনীতি ছাড়াও তার চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো।[৮০]

বঙ্গদেশে পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল স্থায়ী ও সুদক্ষ। বঙ্গ, বিহার তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। উত্তর ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে পাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত। শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক এবং রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজারা 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' ইত্যাদি উপাধি ধারণ করতেন।

এই সময় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সন্ধিবিগ্রহিকের (বিদেশ মন্ত্রী) উল্লেখ আছে।

কখনো কখনো সন্ধি বিগ্রহিকের আগে 'মহা' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। অতএব বলা যেতে পারে 'মহাসন্ধি বিগ্রহিক' বৈদেশিক দপ্তরের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। এই দপ্তর থেকে দূত নিযুক্ত হতো। মহা-সন্ধি-বিগ্রহ আধিকারিক অথবা মহাসন্ধি বিগ্রহিকের পদটি ছিল প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা সন্ধিবিগ্রহিক পদটির উল্লেখ পাই কিন্তু গুপ্তযুগের আগে সন্ধিবিগ্রহিকের পৃথক দপ্তর ছিল না। সম্ভবত মৌর্য সম্রাটগণ নিজেরাই সন্ধিবিগ্রহিকের দায়িত্ব বহন করতেন। গুপ্ত রাজাদের আমলে শাসনব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং সন্ধিবিগ্রহিকের দপ্তর খোলা হয়। সপ্তম শতাব্দীতে সন্ধিবিগ্রহিক পদটি শব্দাড়ম্বরময় হয়ে ওঠে। অবন্তী হর্ষবর্ধনের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। তিনি মহা-সন্ধি-বিগ্রহ আধিকারিক উপাধি গ্রহণ করেন। তার অধীনে বেশ কিছু সন্ধি বিগ্রহিক নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে মহা-সন্ধিবিগ্রহিক এবং সন্ধি-বিগ্রহিক পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার জন্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের শাসকগণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রক্ষার জন্য সন্ধি বিগ্রহিক নিযুক্ত করতেন। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের বিদেশমন্ত্রী নারায়ণ ছিলেন তার দক্ষিণ হস্ত। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় সিহাপেয় কর্ণাটকের প্রধান সন্ধিবিগ্রহিক এবং শ্রীকরপার্দিন ছিলেন বিদেশমন্ত্রী। রাষ্ট্রকূট রাজাদের প্রায় ছজন করে বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। শাসনব্যবস্থায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। রাজ্যের উন্নতি অনেকটাই বিদেশমন্ত্রীর কার্যপরিচালনার ওপর নির্ভর করত। রাষ্ট্রকূটদের মতো গুর্জর প্রতিহার ও পল্লবদের বিদেশ মন্ত্রণালয় ছিল। হর্ষবর্ধন আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিদেশমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।* বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগ থেকে সুরু করে পাল ও সেন যুক্ত পর্যন্ত মহাসন্ধি বিগ্রহিক এবং সন্ধি বিগ্রহিক শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন।

সমসাময়িক কালে 'দূত প্রৈষনিকা' নামক এক শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'বার্তা প্রেরক'। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন দূত ও প্রৈষনিকা রাষ্ট্রদূতের সামিল ছিলেন।

পালযুগে চার শ্রেণির দূতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, দূত, খোল, গমাগমিক এবং অভিওরমান। দূত ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। খোল প্রধানত বিদেশে দূতের চর নিযুক্ত হতেন। গমাগমিক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। অভিওরমান গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করতেন।

পাল, সেন এবং অন্যান্য ছোটোখাটো রাজ্যেও মহাসন্ধি-বিগ্রহিক গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী রূপে বিবেচিত হতেন।[৩৮২] কোনো এক অপরাজিত রাজার সন্ধিবিগ্রহিক আদিদেবের নাম-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর প্রশস্তি থেকে জানা যায়, আদিদেবের পৌত্র

---

* 'As he had to draft foreign despatches, he was to skilled in penmanship. The foreign minister of Harsa often advised him on the exchange of political, cultural and commercial missions...[৩৮১]

ভবদেব ভট্ট পূর্ববাংলার রাজা হরিবর্মদেবের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। গৌড় রাজ্যের মহাসন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন শংকরধর। তার অধীনে একশ মন্ত্রী ছিলেন। সেন লিপিতে সন্ধি বিগ্রহিককে দূতক নামে অভিহিত করা হয়েছে। দূতক-এর দপ্তর থেকে সাধারণত দলিল এবং অনুদান পাঠানো হতো। অনেক সময় যুবরাজ এই সম্মানজনক পদে নিযুক্ত হতেন। ত্রিভুবনপাল এবং রাজ্যপাল ধর্মপাল এবং দেবপালের উত্তরসূরী ছিলেন। তারা যথাক্রমে খালিমপুর ও মুঙ্গের তাম্রশাসনের দূতক ছিলেন।

পাল ও সেনরাজাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যের সুসম্পর্ক ছিল। পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তারা বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় করে তোলেন। সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদের বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য চারটি গ্রাম প্রার্থনা করে তার দূত (dutamukena) রাজা দেবপালের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ব্যাঘ্রতাতিমণ্ডলের অধিকর্তা রাজা দেবপালের প্রিয় পাত্র বলবর্মন ঐ চারটি গ্রামের দূতক ছিলেন। দেবপালের নির্দেশে বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য বলবর্মন ঐ চারটি গ্রাম বালপুত্রদেবকে দান করেন।

পালরাজারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে শান্তনশীল, কর্মশীল এবং অতীশ প্রমুখ বৌদ্ধ পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। তিব্বতরাজ Lhalama ye see ভারতবর্ষে বৌদ্ধ পণ্ডিতের সন্ধানে দুজন দূত প্রেরণ করেন। ঐ দুজন দূত বিক্রমশীলা মহাবিহারে উপস্থিত হয়ে মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের সন্ধান পান। তিব্বতরাজ দীপঙ্করকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানালেন। দীপঙ্কর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইতিমধ্যে তিব্বতরাজ নেপালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। সিংহাসনে বসলেন মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি তার প্রয়াত পিতৃব্যের ঐকান্তিক ইচ্ছের কথা মহাজ্ঞানী দীপঙ্করকে জানালে তিনি তিব্বতে উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ তেরো বছর তিব্বতে অবস্থান করে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতেই তার মৃত্যু হয়। অতীশ দীপঙ্কর আজও তিব্বতে সমাদৃত।

ভারতবর্ষে মুসলিমরা যখন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দূত (ambassadorial system) এবং গুপ্তচর ব্যবস্থা নতুন মাত্রা পায়।[৮০] কূটনীতি এবং গুপ্তচর মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল। *সিয়াসৎনামা* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি শুধু বার্তাবাহক নয়, পররাষ্ট্রে অবস্থানকালে তারা ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা, রাস্তাঘাট, খালবিল, জলাধার, শস্যভাণ্ডার, সৈন্য সন্নিবেশ করার উপযুক্ত স্থান, শাসনব্যবস্থা, সামরিক শক্তি, প্রজাসাধারণের এবং সৈন্যদের মনোভাব, ধন ঐশ্বর্য ইত্যাদি সমস্ত খবর চর মারফৎ সংগ্রহ করবে। যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে এসব খবর জানা একান্ত দরকার।

মুসলিমদের রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে হিন্দুদের ধারণার অনেকটাই সাদৃশ্য ছিল। হিন্দুদের মতোই তারা কূটনৈতিক দপ্তর পরিচালনা করতেন। তারাও বিদেশাগত

দূতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। মুসলিম শাসনগণ মূলত বাগদাদের খলিফার অনুকরণে তাদের শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। কিন্তু ভারতের সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থাও তাদের প্রভাবিত করেছিল। Thus there was a synthesis of the two systems– the Hindu and the Muslims.

মুসলিম শাসনব্যবস্থায় বিদেশমন্ত্রী ছিলেন দেওয়ান-ই রিসালৎ। তার অধীনে ছিলেন দূত। অন্যত্র বলা হয়েছে দিওয়ান-ই-ইনসাৎ (The department of Imperial communication) দবির-ই-খাস-এর অধীনে ছিল। দবির-ই-খাস ছিলেন cofidential clerk of the state. তার অধীনে ছিলেন দবির। এদের কাজ ছিল অনেকটা প্রাচীন ভারতের লেখকদের মতো। এই দপ্তরের মাধ্যমে সুলতান বিদেশি রাষ্ট্র, নিজ রাজ্যের রাজকর্মচারী এবং সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। মুয়াহিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিঠিপত্র আদান প্রদান দপ্তর দেওয়ান-ই-খতম পরবর্তীকালে দেওয়ান-ই-রসিল নামে পরিচিত হয়। মৌর্য রাজাদের মতোই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সমস্ত খবর সংগ্রহের জন্য পৃথক দপ্তর খোলেন।

রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের প্রথা সুলতানি যুগে এবং পরবর্তী মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। মুসলিম শাসনকালের ইতিহাস প্রধান বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে জানা যায়। এইসব বিবরণ থেকেই ইউরোপীয়রা ভারতে প্রবেশের পথ আবিষ্কার করেন।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে তার সঙ্গে এসেছিলেন পর্যটক বিখ্যাত আরব পণ্ডিত অল্-বেরুনী। আরবি, ফারসি ছাড়াও ভারতে থাকাকালীন সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ভারতীয় দর্শন, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। তিনি ভারতীয় হিন্দুদের জাতিভেদ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য, বহু দেবদেবীর উপাসনা এবং বহির্জগৎ থেকে ভারতের বিচ্ছিন্নতার কথাও বলেছেন।

মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকার (মুওর— বর্বর ও আরব মুসলিমদের মধ্যে সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত জাতি) মুওর পর্যটক ইবন বতুতা এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাকে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। এমনকি তাকে দিল্লির কাজির পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। ১৩৩৩-১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ইবন বতুতাকে চীনে কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই দৌত্য ব্যর্থ হয়। চীন থেকে ফিরে ইবন বতুতা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৩৪৯ খ্রি.) ইবন বতুতা তার ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা *Tubaffat-un-Nuzzai fi-Gharaib-it-Amsai* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ঐতিহাসিক V D Mahajan-এর মতে 'There is no doubt that the account of Ibn-Batutah about India is wholly reliable in many respects and the same is corroborated by Zia-Uddin-Barani.'

মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

হয়। এদের মধ্যে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য উল্লেখযোগ্য। অনেক বিদেশি পর্যটক বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। ইতালির নিকোলো কন্টি, পারস্যের রাজদূত আবদুর রজ্জাক, পর্তুগালের পায়েজ ও নুনিজ এবং বারবোসা বিভিন্ন সময় বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করে মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। এদের বর্ণনা থেকে বিজয়নগর-এর সমৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থার অনেক তথ্য জানা যায়।

পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক বলেন, বিজয়নগরের রাজারা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের (plenipotentiaries) অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাদের নানারকম মূল্যবান উপহার দেওয়া হতো। প্রাচীন ভারতীয় প্রথানুযায়ী রাজার পাশেই রাজদূতের আসন নির্দিষ্ট ছিল। আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরের রাজসভায় উপস্থিত হলে রাজা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে নিজের পাশে বসালেন। যথাযথ আপ্যায়নের পর রাজা ঘোষণা করলেন, তিনি মহান পারসিক সম্রাটের দূতকে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। সম্মানিত এই অতিথির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তাহে দুদিন তিনি রাজদরবারে আমন্ত্রিত হতেন। রাজা তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে মনোযোগ দিয়ে তার সমস্ত কথা শুনতেন। প্রতিদিন তাকে অজস্র মুদ্রা, স্বর্ণ এবং অন্যান্য মহার্ঘ্য দ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো।

মুঘল যুগে ভারতের সঙ্গে প্রধানত ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইংলন্ডরাজ প্রথম জেমস-এর সুপারিশপত্র নিয়ে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম হকিন্স এবং ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। জাহাঙ্গীর তাদের সাদরে গ্রহণ করে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ভারতের যে সুসম্পর্ক ও বাণিজ্যিক লেনদেন গড়ে উঠেছিল শাহজাহানের আমলেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল। শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ডেভিড বন্দরে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে তার পুত্র বাংলার শাসনকর্তা সুজা তিনি হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিলেন।

মুঘল যুগে ভারতে আগত পর্যটকদের অধিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। তাদের বিবরণ থেকে মুঘল যুগের ভারত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। ক্যাপ্টেন হকিন্সের বিবরণ থেকে জানা যায় জাহাঙ্গীর ছিলেন উদ্যমী, কর্মঠ ও পরধর্মসহিষ্ণু। তার রাজদরবার আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। রাজদরবারের অভিজাতরা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। তারা প্রায়ই নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। আগ্রার ডাচ কুঠির অধ্যক্ষ পেলসার্ট জাহাঙ্গীরের আমলের অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবন, ব্যভিচার ও লাম্পট্যের নিন্দা করেছেন। সাধারণ লোকের দুঃখ, দুর্দশার সীমা ছিল না।

শাহজাহানের রাজত্বকাল এসেছিলেন তাভের্নিয়। তিনি বলেন, শাহজাহানের রাজসভা ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে পূর্ণ ছিল। ভারতের বহির্বাণিজ্য, আমদানি, রপ্তানি দ্রব্যের বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ঐ সময়ে বাংলার রেশম ও রেশমি বস্ত্র মধ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে রপ্তানি করা হতো। শাহজাহানকে তিনি প্রজাহিতৈষী সম্রাট বলে উল্লেখ করছেন।

মানুচি শাহজাহানের প্রজাহিতৈষণার কথা বলেছেন। তিনি ঔরঙ্গজেবকে পৃথিবীর সব চাইতে ধনী সম্রাট বলে উল্লেখ করেছেন।

ফ্রান্সের বার্নিয়ার ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতৃবিরোধী যুদ্ধের সময় এসেছিলেন। বাংলার সমৃদ্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করলেও তিনি সাম্রাজ্যের অন্যত্র সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্রের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, শাসককুল ছিলেন বিলাসী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী। তিনি বাংলার রেশম, তুলা ও বয়ন শিল্পের কথা বলেছেন। তিনি শাহজাহানাবাদ নগরের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দূতবিনিময় হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর আগে স্থায়ী দূতাবাস স্থগিত হয়নি বলে মনে করা হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক আইনের কথাও জানা যায় না। বর্তমানে দূত ও দূতাবাস সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে।

বর্তমানে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতের মতো বর্তমানেও দূত পররাষ্ট্রে অবস্থানকালে ঐ অঞ্চলের গোপন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সমস্ত খবর সংগ্রহ করে। প্রত্যেক রাষ্ট্র বিদেশি দূতাবাসের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সন্দেহজনক মনে হলে এরূপ দূতাবাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সাধারণত যুদ্ধজনিত কারণ না থাকলে দুটি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। আন্তর্জাতিক আইনে দূতদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ।

গুপ্তচর ও দূত (ambassadorial system) উভয়েই একই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে দূত সম্মানিত অতিথির মর্যাদা লাভ করে। গুপ্তচর সব দেশেই সক্রিয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত নয় বলে বিদেশে ধরা পড়লে গুপ্তচরদের কঠোরতম শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

শান্তির সময় দুটি দেশ দূতের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মত-বিনিময়ের দ্বারা লাভবান হয়। এক রাষ্ট্রের দূত ভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থানকালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। সেখানে তারা সম্মানিত অতিথির সমাদর লাভ করেন। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ উভয় দেশকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু চর? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য চর যে বিপজ্জনক কাজে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য সে কিন্তু নিজ দেশেও সমাদৃত হয় না। বঞ্চনা, অবহেলা এবং ঘৃণার পাত্র গুপ্তচর। জন কেনেথ গলব্রেথের মতে, 'He has perforce to more under cover of false identities and under shadow of disgrace on exposure. A spy has necessarily to be a man who can smile and smile and be a villain 'as Hamlet said and he will always be used but will have to go unhonoured and unsung.'

উপসংহার

ইতিহাস গুপ্তচর প্রথাকে কখনো গৌরবান্বিত করেনি। দেশপ্রেমিক, সুদক্ষ চরের প্রতি কখনো সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। কিন্তু সুদূর অতীতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে গুপ্তচর ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আজও তা সমানভাবে সক্রিয়। বিশ্বের ছোটো-বড়ো সমস্ত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ গুপ্তচর। It is necessary evil– a bridge or connecting link between ancient, mediaeval and modern periods.

গুপ্তচর ব্যবস্থার মূল গঠন ও উদ্দেশ্য সুদূর অতীত থেকে প্রায় একই রয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতির ফলে এর কার্যপ্রণালী (modus operandy) পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চলছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিশ্বের পরিবেশ ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। বৃহৎ প্রতিযোগী বাণিজ্য সংস্থাগুলি চরের মাধ্যমে এক অপরের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আন্দোলন, ধর্মঘট, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্যও তারা চরের সাহায্যে নানারকম খবর সংগ্রহ করে। পুলিশ ও প্রতিরক্ষা দপ্তরে ব্যাপক ভাবে গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। বিদেশি অনুপ্রবেশকারী, অন্তর্ঘাতমূলক ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের ওপর এইসব চরের মাধ্যমে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

আধুনিক গুপ্তচর ব্যবস্থার উদ্গাতা Joseph Fouche. তিনি বিদেশি গুপ্তচরদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্ধারণের কথা বলেছেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন অনুসারে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কার্যরত কোনো বিদেশি গুপ্তচর ধরা পড়লে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুদ্ধের সময় শত্রু নিযুক্ত নিরপেক্ষ দেশের চর ধরা পড়লে অথবা শান্তির সময় কোনো বিদেশি চর ধরা পড়লে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ অথবা নির্বাসন দেওয়া হয়। স্বদেশের কোনো ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রের হয়ে চরবৃত্তি করলে তাকে নিজ দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়।

সম্প্রতি পররাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক খবর সংগ্রহের জন্য নানা আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আজকাল অনেক সময় একটি দেশ অপর একটি দেশের চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর বেতন দিয়ে চেক বুক জার্নালিস্ট নিযুক্ত করে থাকে।

ফোনে Bugging বা আড়িপাতার মাধ্যমেও গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা হয়। বেশ কিছুদিন আগে ইংলন্ডের রাজকুমার চার্লস ডায়নার সঙ্গে প্রাক্ বিবাহ পর্বে নিউজিল্যান্ড গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছু ডায়নার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় তাদের কথোপকথন-এর কিছুটা টেপ করে জার্মান সংবাদপত্র Die Aktnell প্রকাশ করে। এই কথাবার্তায় চার্লস অস্ট্রেলিয় সরকারের বেশ কিছু গোপন কথা ফাঁস করেছিলেন। এভাবে একে অপরের গোপন কথা ফাঁস করার ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে সামরিক ক্ষেত্রে দুইভাবে খবর সংগ্রহ করা হয়। প্রথমত শত্রুর সামরিক শক্তি, যুদ্ধকৌশল, রাস্তাঘাটের মানচিত্র, জনজীবন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির খবর সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে বলা হয় পজিটিভ আর নিজের দেশের সমস্ত খবর গোপন রাখার ব্যবস্থাকে বলা হয় নেগেটিভ।

বর্তমানকালে কোনো একটি দেশের প্রতিনিধি দেশের গোপন খবর তৃতীয় পক্ষের কর্ণগোচর না করে যদি বন্ধু রাষ্ট্রে পৌছে দিতে পারেন তবে তাকে কূটনৈতিক প্রতিনিধির সম্মান দেওয়া হয়। সরকারের সুপারিশ পত্র না নিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো খবর অন্য রাষ্ট্রে বহন করে, তাকে বলা হয় চর এবং আন্তর্জাতিক আইনে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

বর্তমানে স্পাইপ্লেনের সাহায্যে শত্রু রাজ্যের চিত্র সংগ্রহ করা হয়। অনুমতি ছাড়া অন্য দেশের আকাশে ওড়া আক্রমণের (aggression) সামিল বলে গণ্য করা হয়। এই অপরাধে Nurembarg and Tokyo Military Tribunals জার্মানির স্পাই প্লেনকে যুদ্ধ অপরাধী বলে দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘোষণা করেছিল। সরাসরি যুদ্ধ এবং স্পাই প্লেনের সাহায্য খবর সংগ্রহকে সমান অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় স্পাইপ্লেন ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, যুদ্ধ অথবা শান্তি সবরকম পরিস্থিতিতে গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যারা এক পৃথিবী এবং এক আদর্শ সরকারের স্বপ্ন দেখেন তারা গুপ্তচর প্রথাকে একটি ঘৃণ্য ব্যবস্থা বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামরিক এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে গুপ্তচর সংস্থা থাকবে।

উদ্ধৃতিসূত্র

১. The Holy Bible, King James Version, 1961, p. 214-18

২. Illiad and Odyssay BK.X, Andrew Lang, 1950, 166-81

৩. The Art of War in Ancient India, P. C. Chakraborty, 1972, 68

৪. History of Persian Empire, Olmstead 59, Iran Ghirshman, 144

৫. Charlemagne, Wintson, 210, London, 1956

৬. Cambridge Mediaeval Hist, Vol IV. 52

৭. Arab Administration. SAO Hussaini, 274-75

৮. Madras University Journal, 1934, Article entitled 'Culture of the Indus Valley.'

৯. The Calcutta Police Journal, 1963, (I. N. Vol II. No.1)

১০. The Dawn of Civilization, Piggot, p. 245

১১. Ibid

১২. The Sacred Books of the East, Vol. XLII, V, 257 Max Muller, London, 1890-90

১৩. Rig Veda, X, 127

১৪. Atharva Veda XIX, 47.3.ff

১৫. R. V IV. 4.3; Desh– Art by Sukumar Sen, p.2

১৬. A Classical Dictionary of Hindu Mythology etc. 282, John Dowson, London, 1953

১৭. R. V. IV. 4.3 Rigveda with Beng. Tran R. C. Datta

১৮. Ibid 1.1.18, Ibid

১৯. RVX 10.8 Ibid

২০. Atharva Veda IV. 4.1

২১. Sacred Books of the East, Max Muller, London 1890-92 Vol. XXVI 57.19

২২. The Vedic Age, Vol 1, Ed R. C. Majumdar, 360

২৩. Taittiriya Samhita, Trans. by A. Weber S. 7

২৪. The Practical Sans. Eng. Dictionary Part II Vaman Shivaram Apte, ed. P. K. Gode and C. Karve, 1958, 704-698; also chatura (Vaidik charadhatu) which means to hide (Desh, 4 28th January, 1984-Art 'Crime Kahinir Kuluji'— Sukumar Sen.

২৫. The History of Bengal Vol VII Jadunath Sarkar 113

২৬. Ibid

২৭. The Cambridge History of India, Vol I, 86

২৮. Ibid, p. 87

২৯. An Advanced History of Inida, Dr H. C Roy Choudhury, Majumdar and Datta, 42

৩০. The Cambridge Hist of India, I, 86-87

৩১. Gazeteer of India, Ministry of Education and social welfare, P. N. Chopra, Vol II, 120

৩২. The Cambridge History of India, Vol I, 116-117

৩৩. The Pol Hist of Ancient India, 149, Sat BR-V.3.1-148
৩৪. Hist of the Dharma sastras, Vol III, P. V. Kane
৩৫. Ramayana of Valmiki, Ramlabhya and others, Pt Pustakalaya, Kasi, 1951
৩৬. Mbh. P. C. Roy. SP LXXXVI, 21
৩৭. Ibid, LXIX. 9
৩৮. Mbh, Virata, XXVI.8.II.XXV1 10; Udyoga C×c 11.62; Santi LxIx, 8 P. C. Ray
৩৯. Mbh IV, Haridas Siddhanta Bagish Bhattacharya, 1845
৪০. A History of Indian Political Ideas, U. N. Ghosal, 273
৪১. Valmiki Ramayana, Rajsekhar Basu, Aranya Kanda, 164
৪২. Mbh. Santi, LXXXII. P. C. Ray
৪৩. Mbh III Santi LVII-123-24, P. C. Roy
৪৪. Ibid VIII, 124-125
৪৫. Ibid SP LXX 162-63 and LXXXVI, 197
৪৬. Uttararamacaritam-140-42, Trans. Prafulla Chandra and others. Pub. by Sanskrita Sahitya Sambhara.
৪৭. A History of Indian Pol. Ideas, U. N. Ghosal, 267 Sisupalbadha 2, 112, 183
৪৮. Pol. Hist. of Anc. India. H. C. Roy Choudhury Vide 260 (The Mahabastu 1.34)
৪৯. Ibid, p. 86
৫০. Jataker Gapla IV Ishan Ch. Ghose, 332.
৫১. Pratijnayaugandhrayana, Trans. Prafulla ch & others, pub. Samskrita Sahitya Sambhara p. 12
৫২. Sacred Books of the East, Max Muller Vol XLIX 85-87, 102-103
৫৩. A Hist of Indian Pol. Ideas, U. N. Ghosal, p. 88
৫৪. Kasidasi Mahabharat, p. 365
৫৫. Jataka III, Cowell, 73-74
৫৬. Jataker Galpa IV, Ishan Ch. Ghose, 5-9
৫৭. Jataker Galpa V. 59 Ishan Ghose
৫৮. Ibid VI 269
৫৯. Masudi Muruj-al-cthahab VII, 127
৬০. Indian Police Journal XXIX, 1983
৬১. Ibid
৬২. Ibid
৬৩. Ibid
৬৪. Ibid
৬৫. Musudi-Muruj al-dhahab, 127
৬৬. Jataker galpa, Ishan ch. Ghose, 220-221
৬৭. Jataka V, Cowell, 119
৬৮. Cambridge History of India, Vol 1, 333
৬৯. Trans. of Fragments of the Indika of Megasthenes, collected by Dr. Schwanbeck and of First Part of the Indika of Arrian, Jw. McGrindle 35-36
৭০. Camb. Hist of India, Vol I 369

৭১. Meges ende Indische Maatschappiyi-Trans. Limner, p. 170
৭২. The Early Hist of Bengal, B. Sarkar, p. 143
৭৩. Anc. Ind. as Described by Megasthenes and Arrian, J. W. McCrindle, p. 217
৭৪. Arthasastra Beng. Trans. Radha Govinda Basak
৭৫. Ibid, 27
৭৬. Ibid, 23
৭৭. Yajnavalkya Smriti A. D 100
৭৮. Naradasmriti A. D 100
৭৯. Brihaspati Smriti A. D 300
৮০. Vishnu Puran 300 A. D
৮১. Markandeya Puran A. D 300
৮২. Kamandaka Nitisara A. D 400
৮৩. Mudra Rakshasa, Visakha Datta A. D 400
৮৪. Dasakumar Carita, Dandin A. D 600
৮৫. Kritya Kalpataru, Lakshmindhar A. D 1100
৮৬. Manasoll as a, Sameswara A. D 1131
৮৭. Rajtarangini, Kallhana A. D 1150
৮৮. Sukraniti Sara, (Early medieval period)
৮৯. Artha Sastra Shyam Sastri 1. 1. 1-4
৯০. An Introduction to the study of Indian History, D. D. Kosambi 211
৯১. * Ibid 70 History D. D Kosambi, 211
৯২. * Ibid, p. 70
৯৩. Artha Sastra, Shyam Sastri 1.1. 1-4
৯৪. Ibid 42
৯৫. Ibid 43
৯৬. Ibid 43
৯৭. Hindu Adm. Institution– V. R Dikhitar, Ed. S. K. Aiyanger p. 98
৯৮. Gaekwads' Oriental series, KBL X142
৯৯. Artha Sastra– Ed. trans. R. Shama Sastry– R. P Kangle– XXI; 44
১০০. Artha Sastra– Radha Govinda Basak XX Sham Sastri 1. XX., R. G. B-27-28
১০১. Ibid 1.XX
১০২. Sukraniti, B
১০৩. Sukranitisara Bks. 30
১০৪. AS. S.S 1.XX
১০৫. A.S. I. S. S. IXVII, 32
১০৬. Ibid A. S. R. G. B 1.X.VII
১০৭. Ibid IXVIII
১০৮. A Hist. of Indian Pol. Ideas, U. N. Ghosal, p 285
১০৯. A. S. R. G. B IXV
১১০. Hist of Dharma Sastras Vol III, P. V. Kane, 1930, p. 108

১১১. Ibid
১১২. H. I. P. I. U. N. G, p. 285
১১৩. A. S. R. G. B IXIX
১১৪. Sacred Books of the East XXV, 228
১১৫. AS SS IXI/Sukra Bks 37
১১৬. AS. SS 1.XI
১১৭. Ibid
১১৮. War in Anc. India, V. R. Dikshitar 353
১১৯. Pol. Hist. of Anc. India. H. C. Roy Chowdhury 259
১২০. SBE XXV, 154
১২১. AS R. G. B 1.XI
১২২. Ibid IXI
১২৩. Ibid IXII
১২৪. Mudra Rakshasa, Trans. S. C. Chakraborty, P. 790-91 (1-10)
১২৫. Ibid P. 60
১২৬. Sukra 11-141-143, P. 168
১২৭. Ibid 149-68
১২৮. Sisu Palabadha-183
১২৯. AS R. G. B IXII
১৩০. Ibid II, IX
১৩১. AS-SS IXII
১৩২. AP-11 CC XX M. N. Dutta-790-91
১৩৩. AS RGB IX III
১৩৪. Ibid SS IXII
১৩৫. AP II CCXX M. N. Datta 790-91
১৩৬. AS RGB IXIII
১৩৭. Chl I 257-58
১৩৮. AS IXII
১৩৯. Ibid XXXII
১৪০. Ibid IIXXXV
১৪১. Markandeya Purana, Bary T B and others 27, 21-5
১৪২. Pub Adm in Anc India, P. N. Banerjee p. 74
১৪৩. ASIIXXXV
১৪৪. AS RGM IXII
১৪৫. Manu Smriti, VII, 114-117
১৪৬. Agni Purana II CCXX 790
১৪৭. Ibid
১৪৮. AS RGB IXII
১৪৯. Agni Purana II CCXX 790-91
১৫০. Manu Smriti VII 114-117

১৫১. Vishnu Purana Pub Sans Sahitya Sambhara, p. 301
১৫২. Ibid, P. 30-31
১৫৩. Ibid, P. 301, 256-60
১৫৪. Narada Smriti (SBEXXXIII, 12)
১৫৫. Abhignana Sakuntalam by Kalidasa, Trans. Ramendra Mohan Ghose, VI, 1, 14
১৫৬. Sukra IV, V, 138-139 IV, V 135-136
১৫৭. Ibid
১৫৮. SBE XXV, VIII (Laws of Manu, Rules 314, 315, 316)
১৫৯. As, XIV
১৬০. Manu Smriti, G. S. Jha with Manu. Bhasya of Madhatithi with commentary of Kuluka, Cal 1922-29, Bombay, 1946
১৬১. Agni Purana, Eng Trans. M. N. Dutta II CCXL9, 864, 11-14
১৬২. The Ocean of Stories, C. H. Tauney (Eng. Rendering of Katha Sarit Sagore)
১৬৩. Hitopadesh, Beng Trans H. C Bhattacharya, 88-86
১৬৪. AS XIV
১৬৫. News Writing in Mediaeval India, Jagadish Narayan Sarkar, 110
১৬৬. Masudi-Muruj-at-dhabab VII p. 127
১৬৭. AS LXVI
১৬৮. Gazeteer of India, Ministry of Ed and Social Welfare, P. N. Chopra, 122
১৬৯. MR, 2.16
১৭০. MR 2.16
১৭১. Manimekhalai in its Historical Setting-S.K. Aiyanger, 187
১৭২. Rajtarangini, VIII 2200
১৭৩. AS BKIXVIXVII, BK VIII.1
১৭৪. PHAI-249
১৭৫. Ibid 259
১৭৬. AS IIXXXV
১৭৭. The Edicts of Asoka-Trans by G. Srinivasa Murti and A. N. Krishna Aiyanger, R. E. VI
১৭৮. Asoka and the Decline of the Mauryas-Romila Thapar-III
১৭৯. Ibid, 103
১৮০. PHAI 283-284
১৮১. Corpus Inscriptionum Indicasum
১৮২. ADM110 Asoka & the Decline of the Mauryas by Romila Thaper Vol I, p. 110
১৮৩. PHAI-351
১৮৪. Ibid, 205
১৮৫. PHAI 455
১৮৬. Ibid 283-84
১৮৭. PHAI 455
১৮৮. Ibid 464
১৮৯. PHAI 356

১৯০. Hist of India (From the beginning to 1526 AD), p. 20
১৯১. PHAI 372
১৯২. দেশ ১.২৮.৮৪ প্রবন্ধ : সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৩
১৯৩. India under the Kusanas— B. N. Puri, 83-84
১৯৪. Kusana State and India/Society in the Post Maruyan Period-Bhaskar Chatterjee, p. 196. Vide Manimekhalai Inscription 19-101, 102
১৯৫. Ibid
১৯৬. The Gupta Empire, R. K. Mookherjee, 151
১৯৭. Mudra Rakshasa of Visakhadatta, Pub. Sanskrita Sahitya Sambhar, Prafulla Ch. Basu & Others. 1.16,20; 2.1.15 etc., Kriatarjuniyam, 1.19. Sisupalbadha 11.82, 113 XX23 PHAI 496-497
১৯৮. The Gupta Empire, R. K. Mookherjee, 151
১৯৯. Ibid 152
২০০. Ibid 152
২০১. Ibid
২০২. Ibid 153
২০৩. PHAI 496
২০৪. Ibid 496
২০৫. The Military System in Anc. India-B. K. Majumdar
২০৬. Corpus Inscriptinum Indicarum, Vol III, p. 65 J. Fleet, 104
২০৭. Harsa– a political study– D. Devahuti, 150 vide Hsi-yi-chi text
২০৮. Ibn Batuta, Gibs, 183
২০৯. Harsa– a political study– D. Devahuti, 150 vide Hsi-yi-chi text
২১০. HPS D.D 150
২১১. Bana's Harsa Charita, Geiger and M. H. Basu (Trans)
২১২. Harsa– a political study– DD 150, 152 Vide Hsi-yi-chi (text) of Beal 215-18 no 36, Wallers iR 344
২১৩. Gaekwad's Oriental series, Kritya Kalpataru of Bhatta Lakshmidhara, X142
২১৪. The Art of War in Anc. India, P. C. Chakraborty, 67
২১৫. Epigraphia Indika, Vol VIII 162
২১৬. Kalhanas' Rajtarangini, Tr. M. A Stein Vol II, VII, 33II; VII 627; VII 71, VII 629, 1016, 1045 VIII 1326, 2085-2220 etc
২১৭. Early History of Bengal, 129
২১৮. Hist. of Bengal I, 277
২১৯. Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal-Benay Ch Sen-539
২২০. Ibid 277
২২১. Ibid 122
২২২. Ibid 540
২২৩. Ibid
২২৪. Bangalir Itihas, Niharranjan Roy, 415
২২৫. The Early Hist of Bengal, B. Sarkar 116
The Hist of Bengal, Jadunath Sarkar, 277

২২৬. Early Hist of Bengal 147-148
২২৭. Cf H. B II J. N. Sarkar
২২৮. War in Ancient India V. R. R Dikshitar, p. 353
২২৯. Ibid, 353, Kural L9, LII (Trans Lazarus)
২৩০. Ibid 353
২৩১. Epigraphia Indika XIV, 182-88
২৩২. EI XXII, 167
২৩৩. Nitivakyamtra, 59
২৩৪. The Rashtrakutas and their times, A. S. Altekar, 155
২৩৪. Some Aspects of Medieval Indian Adm. Burton Stein-82
২৩৫. Al Idrisi, Jaubert 1.88/Fatwa-yi Jahandari, Eng. trans. Barne, Habid Begum P. 1
২৩৬. SB.E XLII. 257
২৩৭. The Cambridge History of India Vol 1, p. 51
২৩৮. Ibid p. 51
২৩৯. Ibid, 51-52
২৪০. Cambridge Medieaval His. IV, Chp 10, Sir T. W. Aranold, p. 283
২৪১. Life and times of Sultan Mahmud of Ghazni, Naxim, p. 144-46
২৪২. Al-Idrisi, Jaubert 1.88/Fatwa-yi-Jahandari Eng.tr. Barne, Habid Begum p.1
২৪৩. Barani, Elliot and Dowson III 102, 179-80, 181, 195 M Aziz Ahmad– Early Turkish Empire of Delhi, 362-63
২৪৪. M Aziz Ahmad - Ibid
২৪৫. Ibid
২৪৬. Ibid 246 b) Ibid
২৪৭. Elliot and Dowson III, 179-80, 181, 195; K S Lal History of the Khaljis, 236-40
২৪৮. Ibid
২৪৯. Ibid
২৫০. H Hussain, The Rehla of Ibn Batutah XXIX; Masalik ul Absar, in Elliot and Dowson III, 581
২৫১. News writers of Mugha/India-Jagadish Narayan Sarkar - p. 113
২৫২. Ain-i-Akbarih-Phillot I 268-70
২৫৩. Jadunath Sarkar, Aurangzeb V. 216
২৫৪. Jadunath Sarkar, Mughal Administration III (1963ed), p. 61-64
২৫৫. Diaries of Streynsham Master, Hedges' Diary Yusuf H Khan 'Seventeenth century waqai', Islamic culture, July 1954
২৫৬. Jadunath Sarkar, Mughal Adm. 61; Siyar-al-Mutakherin 62-64
২৫৭. Ibid
২৫৮. Ibid
২৫৯. Baharistan-i-Ghaibe, 225; Barah Eng.trans I 209
২৬০. Mirat-i-Ahudi, Sarkar, Mughal Adm. Saran, 198-9
২৬১. Baharistan-i Ghaibi 225; Borah Eng. trans 209
২৬২. Ibid

২৬৩. Bernier (constable) 231
২৬৪. Fryer - New Account of East India and Persia (crookes ed) I, 344
২৬৫. Storia-do-Mogar (new ed) II, 309, 395-96
২৬৬. S N Sen - Indian travels of Jherenot and Gemelli Careri - p 26
২৬৭. Siyar III p 174 (cambray ed)
২৬৮. J. N. Sarkar - Mughal Adm. 62-63; Rogers and Beveridge I 203
২৬৯. Islamic culture, Jan (1928) p. 133
২৭০. Storia, new ed II, p. 209
২৭১. Ibid, 395
২৭২. J. N. Sarkar, Mughal Adm, 63; Siyar-cambray ed. III, 173
২৭৩. J. N. Sarkar, Mughal adm. p. 142
২৭৪. a) Babar's memoirs, Mrs. A Beveridge III, 663
b) Manucci (old) II 128, Saran p. 201
২৭৫. Beniprosad - Jahangir; Hawkins voyage p. 400-1
২৭৬. Camb. medieval history IV, 283
২৭৭. News-writers of Mughal India - J. N. Sarkar, p. 122
২৭৮. Faix Bakhsh Munshi - Tarikh-i-Farah Baksh
২৭৯. Ibid
২৮০. Catron, Hist. of the Mughal Dynasty (staria) old ed, 11, 18
২৮১. Jadunath Sarkar - Anecdotes of Aurangzeb - Vol V. p. 44
২৮২. Sarkar, Aurangheb, V 366; Mughal Adm, ch 5
২৮৩. Ibid, p. 127-128
২৮৪. Ibid, p. 186
২৮৫. Anecdotes of Aurangzeb No. 32 (Sarkar)
২৮৬. Sarkar, Aurangzeb V. 150m based on Akhbarat 9.3.1702
২৮৭. Sarkar, Aurangzeb (Mughal Adm. Ch V)
২৮৮. Yusuf Husain Khan, seventeenth century waqai, Islamic Culture, July 1954; Rogers and Beveridge I. 330-1
২৮৯. Ibid
২৯০. Rogers and Beveridge 1. 330-1
২৯১. News writers of Mughal India - Jagadish Sarkar - p. 125
২৯২. Ibid
২৯৩. The Publication of the Ordinances of Jahangir ... I 26, Rogers I 205, Elliot and dowson VI, 325
২৯৪. Rogers 1. 13 172. 262. 263. 265, 301-2, 389-90, 421; Roe 116-7; Howkins (Purchas III 43) Beniprosad Jahangir
২৯৫. Muqaddama-i-Ruqaat-i-Alamgiri 228-29, in Islamic Culture, July, 1954.463
২৯৬. Ibid
২৯৭. Ibid
২৯৮. News writers of Mughal India - Jagadish Narayan Sarkar p. 131
২৯৯. Akbar Namah (Beveridge) III 879; R N Prosad - Man Singh, 82-3

৩০০. Bermier (constable) 231

৩০১. Storia old II 450-51)

৩০২. Fryer (crooke) Hakluyt Soc II Blochmann, Journal of Asiatic Society of Bengal (1872, 52)

৩০৩. Haft Anjuman - trans, Jagadish Narayan Sarkar - Article - Mirza Raja Jai Singh's policy in Bijapur. Journal of Indian Hist - Dec. 1965, p. 760.

৩০৪. (a) War in Ancient India, Dikshitar, 217.
(b) History of Anc. India. S. K. Aiyanger 286-87

৩০৫. War in Anc. India Dikshitar 286-87

৩০৬. Artha Sastra R. G. Basak I. XVI, XIII, II

৩০৭. Mahabharata, Haridash Siddhanta Bagish Bhattacharya CXI. 15. Santiparva

৩০৮. Sukranitisara, Bishagratna K. KL IV 11863

৩০৯. Agnipurana, M. N. Datta (Eng tr.), Vol II, 863

৩১০. (a) Mahabharata, Sabha Parva, (Trans. in Eng.) P. C. Roy, p. 20
(b) Sacred Books of the East XXV, Egglins Julias, p. 245

৩১১. Political History of Ancient India, H.C. Roy Choudhury, p. 85-86

৩১২. Agama and Tripitaka, Muni Srinagaraja, p. 349, Vide Buddha Charita, p. 484; Buddhism and Vaisali, H. R. Ghosal and J. Kumar, p. 54

৩১৩. Inter-state Relation in Anc. India, N. N. Law, p. 12; Aitareya Brahmana, Trans Keith IV23, XIX, IIV. 25, 19-3 (Asiatic Society Journal) Kamandaka Nitisara, ed. with commentary of Sankaraya. T. Ganapati Sastri. VII 25. Trivandram Sans Series, Kautilya BK VIII

৩১৪. Ramayan (Aranya Kanda). Rajsekhar Basu, p. 158 (নিজাম রাজ্যের বিদর জেলা, মতান্তরে নাসিকের নিকট)

৩১৫. Ibid p 170

৩১৬. Ibid 171

৩১৭. Ibid 205

৩১৮. Ibid 205

৩১৯. The Ramayana of Valmiki, T. R. Atkins 15-41, 37, 12-3, 41-43.

৩২০. Valmiki Ramayana (Yuddha kanda), Rajsekhar Basu, 1-5, 289, 37-40, 311

৩২১. Mahabharata. Adiparva, Rajsekhar Basu. p. 64-65

৩২২. Ibid, Sabhaparva XXI

৩২৩. Santiparva, V-15

৩২৪. Jatakcr galpa, Ishan Ch Ghose, VI, 269

৩২৫. Katha Sarit Sagara, Somdeva Suri, Pub. Basumati Sahitya Mandir, trans. Smvititivtha Kamal Krishna 1.110

৩২৬. Pol. His. of Anc. India, V.D. Mahajan. p. 337

৩২৭. Cambridge Hist. of India, Vol I, p. 318

৩২৮. CHI. VI, p. 324

৩২৯. Artha Sastra. R. Sham Sastri-R. P. Kangle B K IX. VI, 86

৩৩০. Ibid., p. 338

৩৩১. Ibid XIII, IV, 444, 441

৩৩২. Pol Hist of Anc. India, Vide Br. Samhita. Kern, p 25
৩৩৩. Camb. Hist II 30. Vide India as described by Ctesius. Me Crindlc 3-4
৩৩৪. Ibid, p. 34
৩৩৫. PHAI H. C. Roy Choudhury, p. 321
৩৩৬. Ibid 321
৩৩৭. Travels of Ludorico D Varthama. G. P Badger, 1863
৩৩৮. Manu VII, 195 (Buhler's tr. S. B. E XXV, 247)
৩৩৯. Susruta Samhita, Eng. tr. K.KL Bishgratna, Cal, 1911, Vol II, 696-698
৩৪০. WAI Dikshitar p. 301
৩৪১. EHI. V.D Mahajan p. 38
৩৪২. Rg Veda I Beng. tr. R.C. Datta-245
৩৪৩. EHI, Mahajan-65-66; Camb. Hist IV-50-53
৩৪৪. Atharva Veda III.IV.1.6 Trans and Ed Bijan Behari Goswami
৩৪৫. Mahabharata, Udyoga Parva, Kali Prasanna Singha
৩৪৬. Digha Nikaya, Maha parinibban sutta 21/3/16
৩৪৭. The dialogue of Buddha (Diplomacy in Anc. India) S. L. Roy p. 91
৩৪৮. WAI, Dikshitar VIII, 301
৩৪৯. Arthasastra Ed, tr. R. Sham Sastri-R.P Kangle, VII. 7
৩৫০. Manu VII, 65, 109, with Manu Bhasya of Medhatithi, Yanand ed with commentary of kuluka, Cal 1922-29, Bombay 1946
৩৫১. Ibid. 166, 171, 173, 168, 208-209
৩৫২. Anc. India as described by Megasthenes and Arrian (Fragmentary records in part II, Cal 1926, Mc. Crindle), p. 154
৩৫৩. Kamasutra of Vatsayana Tr. S. C. Upadhyaya XII. 32
৩৫৪. Agni Purana Vol II. Tr. M. N. Datta 241, 11-13
৩৫৫. Vedic Index, 2 vols, A. A Medonell and Keith
৩৫৬. Dynamics of Diplomacy. GVG Krishnamurti; Agni Purana M.N Datta II CCXX 788
৩৫৭. Dynamics of Diplomacy G.V.G Krishnamurti, p. 342
৩৫৮. Chamber's Twentieth Century Dictionary, p. 342
৩৫৯. Diplomacy— Harold Nicolson 63
৩৬০. (a) Mbh (Udyaga Parva Manava Dharma Sastra 63-64; Politics and Ethics in Anc. India Manorama Jauhuri, Vide Ramayana Vidyalankar Chandragemin 52.21
৩৬১. Life of Hiuan Tsang by the Shaman Hwai Li. Tr. S. Beal. p. 180. E and Dowson on 11, 535
৩৬২. Hist of India, Mahajan, p. 290
৩৬৩ Elliot and Dowson II 625-626
৩৬৪. State and Govt in Anc. India. A.A. Alteckar. p. 85
৩৬৫. Pol Hist of Anc. India 182
৩৬৬. Journal of the Royal Asiatic Society 860, 309. CH II 597
৩৬৭. Hindu Adm. Institutions. V.R. Dikshitar Ed. S Aiyanger p. 5
৩৬৮. Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III Elect, 13

৩৬৯. Hist of India, Mahajan, p. 175

৩৭০. HAI, 582-583

৩৭১. PHAI, 482-483

৩৭২. The Mahavamsa tr. Geiger XXXIX Journal Asiatic Society 1900, 316. Indian Antiquities 1902, p. 194

৩৭৩. EHI V.D. Mahajan p. 297

৩৭৪. Public Adm. in Anc. India, P.N. Banerjee, p. 84

৩৭৫. Harshavardhan, Eltringhausen 54-57

৩৭৬. The Classical Age : The Hist and Culture of the Indian People Vol III Ed R.C Majumdar A.D Pusalkar, A. K. Majumdar, p. 120-121

৩৭৭. Ibid, 124-126

৩৭৮. Ibid, 240

৩৭৯. Hist of the Gahadval Dynasty. Rama Neogi, p. 79, 83

৩৮০. Ibid 154

৩৮১. Harsa a Political study - D Devahuti. p. 174

৩৮২. Journal of Indian Research Institution Vol I, 116

৩৮৩. Studies in Muslim Pol. Thought and Adm, Sherwani H. K.. 146-148

রাষ্ট্রের সুশাসন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার কারণে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ শাসনব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বের ছোটোবড়ো সমস্ত রাষ্ট্রেই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র, সামরিক বিভাগ এবং পুলিশ দপ্তর—অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রেই রয়েছে গুপ্তচর। এই গুপ্তচরবৃত্তির নানাদিক নিয়ে লেখিকা আলোচনা করেছেন এই বইয়ে।

978-93-80732-05-3

অবভাস